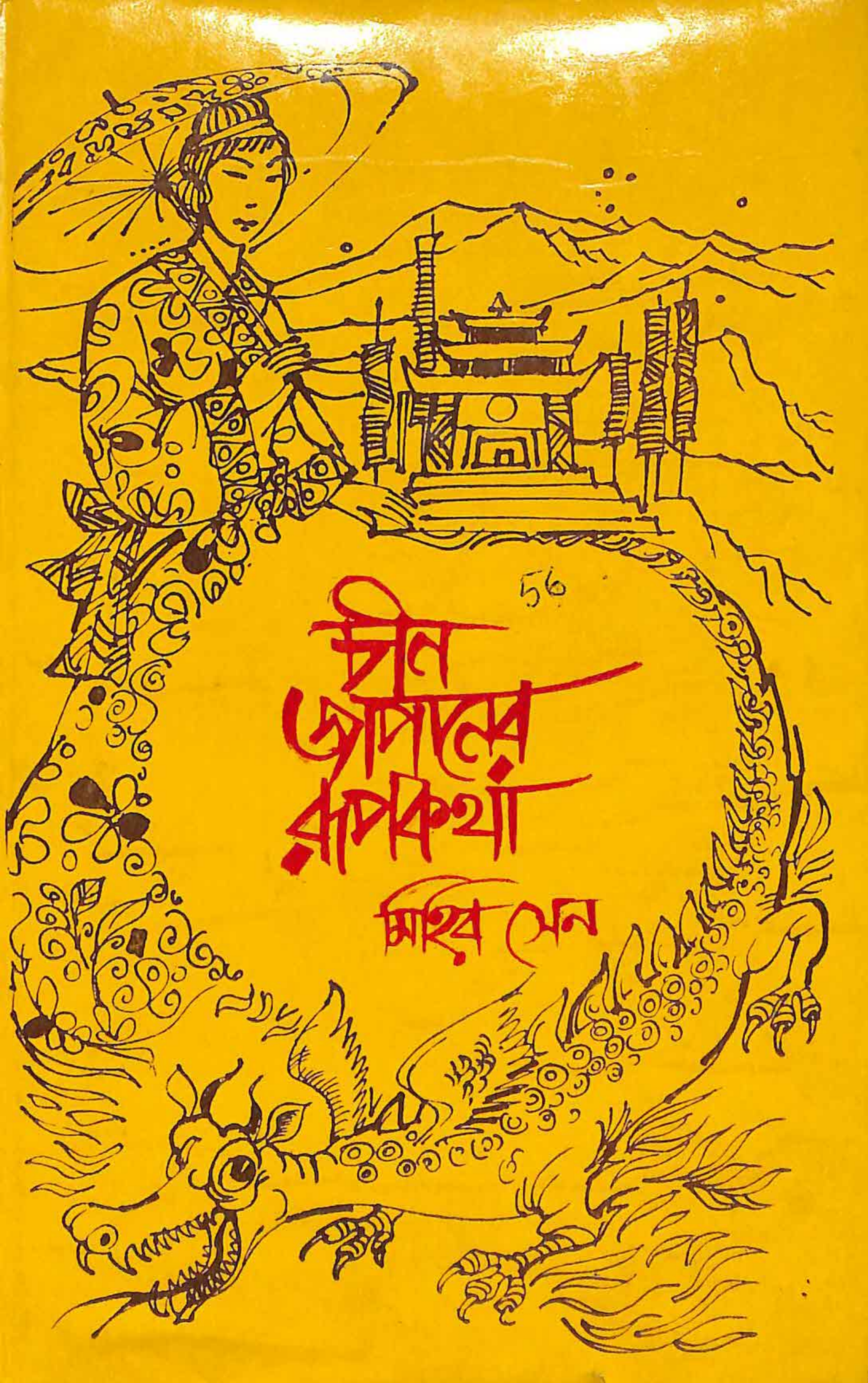

56
চীন
জাপানের
রূপকথা
মিহির সেন

# চীন জাপানের রূপকথা

মিহির সেন

লিপিকা ঃ ৩০/১এ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

Chin Japaner Rupkatha
Folk tales of Chin and Japan
Retold by : Mihir Sen.


- প্রথম প্রকাশ :·········১৩৯৪/জুন ১৯৮৭
- প্রকাশক :···ডি. চক্রবর্তী/লিপিকা, ৩০/১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
- মুদ্রাকর : পরেশনাথ পান ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
- প্রচ্ছদ ও ছবি : সর্বজিৎ সেন

মূল্য : দশ টাকা

বেগম সোনাকে

# সূচীপত্র

## লেখকের ছোটদের অন্যান্য বই

কলাবতী ( ছড়া )
টিক্‌টিক্ ( ছড়া )
খুকুর পুতুল টুকটুক ( গল্প )
ক্ষুদে গোয়েন্দা পিকলু ( গোয়েন্দা গল্প )
লোক জাগানো লোকটি ( জীবনালেখ্য )
লেলিনের মা ( জীবনালেখ্য )
ইশারা ( নাটক )

## সুখের পাখি

অনেক অনেকদিন আগে তিব্বতে এমন একটি জায়গা ছিল যেখানে কোন নদী ছিল না, উর্বর জমি ছিল না, ফুল ফুটত না, বড় গাছ ছিল না, ছিল না সবুজ ঘাস। সেখানকার মানুষ সারা বছর ধরে খিদে আর শীতে কষ্ট পেত। জানত না তারা সুখ কাকে বলে। তবু তারা বিশ্বাস করত, পৃথিবীর কোন এক জায়গায় সুখ বলে কিছু আছে।

বৃদ্ধরা বলতেন, আসলে সুখ হল একটি সুন্দর পাখি। এখান থেকে অনেক অনেক দূরে, পূর্ব দিকে, তুষার-ঢাকা এক পাহাড়ে বাস করে সুখ নামে সেই পাখিটি। পাখিটি যেখানেই উড়ে যায়, সেখানেই সুখ নিয়ে যায় সঙ্গে। প্রতি বছরই কিছু মানুষ যাত্রা করে সেই পাখির সন্ধানে। কিন্তু তাদের কেউ আর ফিরে আসে না। কারণ, সেই সুখ পাখিটিকে পাহারা দেয় ভয়ঙ্কর তিন দৈত্য। তারা তাদের লম্বা দাড়ির ফাঁক দিয়ে শুধু ফুঁ দিয়েই মেরে ফেলতে পারে মানুষকে।

একদিন সেখানকার অধিবাসীরা ওয়াংজিয়া নামে খুব সাহসী ও রূপবান একটি ছেলেকে পাঠাল সেই সুখ পাখির সন্ধানে। ছেলেটির যাত্রা করার সময় সেখানকার রীতি অনুযায়ী, মেয়েরা ছেলেটির হাতে তুলে দিল যবের শরবৎ। আর মায়েরা তার মাথায় যব দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

ওয়াংজিয়া সোজা হেঁটে যেতে লাগল পূবের পথ ধরে। অনেকদিন হাঁটার পর একদিন সে সামনে দেখতে পেল বিরাট এক পাহাড়। পাহাড়টি রূপোর মতো ঝকঝকে তুষারে ঢাকা।

হঠাৎ তার সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল, লম্বা কালো দাড়ি-ওয়ালা এক বিকট দৈত্য। কাকের মতো কর্কশ গলায় চীৎকার করে বলল, 'কে তুই? কোন্ সাহসে এসেছিস এখানে? কী চাস তুই?'

ছেলেটি বলল, 'আমার নাম ওয়াংজিয়া। আমি সুখের পাখিকে খুঁজতে এসেছি।'

শুনে হো-হো করে হেসে উঠল দৈত্য। বলল, 'তোর মতো একটা পুঁচকে ছেলে কোন্ সাহসে এসেছিস এখানে? সুখের পাখিকে পেতে হলে আগে তোর হত্যা করতে হবে লুওসাংয়ের মা-কে। পারবি তা? যদি না পারিস তাহলে শাস্তি পেতে হবে তোর। আর তোর মতো একটা পুঁচকে ছেলেকে মারতে আমার নিজের কিছু করতে হবে না। আমি তোকে ন'শো মাইল এবড়োখেবড়ো পাথুরে পাহাড়ী পথে হাঁটাব, আর তাতেই তুই খতম হয়ে যাবি।'

ওয়াংজিয়া বলল, 'আমি আমার মাকে ভালবাসি। তাই আর কারো মাকেও হত্যা করতে পারব না। তোমার যা খুশি করতে পার।'

রাগে গর্জে উঠল দৈত্য। দাড়ির ফাঁক দিয়ে প্রচণ্ড জোরে একটা ফুঁ দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের মসৃণ পথটা হয়ে গেল বিশাল লম্বা একটা এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ। প্রতিটি পাথরের টুকরোগুলোর মাথা যেন তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা।

সেই পথ ধরেই এগিয়ে যেতে লাগল ওয়াংজিয়া। প্রথম একশ' মাইল হাঁটার পর পাথরের খোঁচায় ওর জুতোটা ছিঁড়ে খসে পড়ল পা থেকে। পরের একশ' মাইল যেতে পা কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। রক্তে ভেসে গেল পা।

যেতে যেতে ভাবল ওয়াংজিয়া, 'এভাবে আর কি এগিয়ে যেতে পারব? নাকি ফিরেই যাব?' সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজের মনেই বলল, 'না। কিছুতেই ফিরে যাব না আমি। আমি সুখের পাখি নিয়ে ফিরব বলে সবাই আমার পথ চেয়ে বসে আছে। খালি হাতে আমি কিছুতেই ফিরব না।'

ওয়াংজিয়া আর হাঁটতে পারছিল না। এবার তাই হাতে পায়ে হামা দিয়ে এগোতে লাগল। পাথরের খোঁচায় হাঁটু আর হাতদুটো কেটে ফালাফালা হয়ে গেল। জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত পথের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল ওয়াংজিয়া। আর উঠে

দাঁড়াতেই দেখতে পেল, সামনে দাঁড়িয়ে আর একটি বিরাট দৈত্য। দাড়িগুলো তার বাদামি। গলার স্বর যেন ঝড়ের শিস্।

দৈত্যটা হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'সুখের পাখিকে যদি দেখতে চাও তাহলে প্রথমে তোমার বিষ দিয়ে হত্যা করতে হবে বৃদ্ধ সিলাংকে। যদি না পার তাহলে তোমাকে আমি উপোস করিয়ে মারব।'

ওয়াংজিয়া বলল, 'তোমার যত জোরে ইচ্ছে চীৎকার করতে পার। আমার নিজের দাছুকে আমি ভীষণ ভালবাসি বলেই কোন বৃদ্ধকে আমি হত্যা করতে পারব না।'

দৈত্যটা প্রচণ্ড চটে গিয়ে দাড়ির ভেতর দিয়ে এমন জোরে এক ফুঁ দিল যে, তাতে ওয়াংজিয়ার খাবারের থলেটা আকাশে উড়ে গিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। চোখের সামনে নদী আর সবুজ বন বিশাল এক মরুভূমি হয়ে গেল। জল নেই। কোন ফল নেই।

আবার হাঁটতে শুরু করল ওয়াংজিয়া। খিদেয় পেটে যন্ত্রণা শুরু হল। চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে গেল। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে আর বোধহয় পারবে না। মৃত্যু ওর সামনে দাঁড়িয়ে।

তবু কোন রকমে পা টেনে টেনে এগিয়ে চলল ওয়াংজিয়া। তারপর তু'শ মাইল পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছাল পথের শেষে।

এখানে ওর পথ রোধ করে এসে দাঁড়ালো তৃতীয় দৈত্য। দাড়িগুলো তার তুধের মতো সাদা।

চীৎকার করে বলল দৈত্য, 'বেপরোয়া মূর্খ, এখানে এসেছিস কেন?'

ওয়াংজিয়া বলল, 'আমার নাম ওয়াংজিয়া। আমি সুখের পাখির সন্ধানে এসেছি এখানে।'

দৈত্য বলল, 'সুখের পাখিকে দেখতে হলে আমাকে এনে দিতে হবে বাইমা মেয়েটার চোখের তারা। যদি অস্বীকার করিস তাহলে এক্ষুনি আমি তোর চোখের তারা তুটো উপড়ে নেব।'

নির্ভয়ে উত্তর দিল ওয়াংজিয়া, 'অসম্ভব। সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ের চোখের তারা উপড়ে আনার অধিকার কারো নেই। আমি পারব না।'

রাগে গর্জে উঠল দৈত্য। লম্বা দাড়ির ফাঁক দিয়ে এমন জোরে এক

ফুঁ দিল ওয়াংজিয়ার দিকে, যে সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের মণিদুটো চোখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। অন্ধ হয়ে গেল ওয়াংজিয়া।



এত যন্ত্রণার ভেতরও ভাবল সে, 'এটাই নিশ্চয়ই আমার শেষ পরীক্ষা। আমি থামব না, এগিয়ে যাব। সোজা এগিয়ে যাব ভোরের সূর্যের দিকে। নিশ্চয়ই সেখানেই থাকে সুখের সেই পাখিটি।'

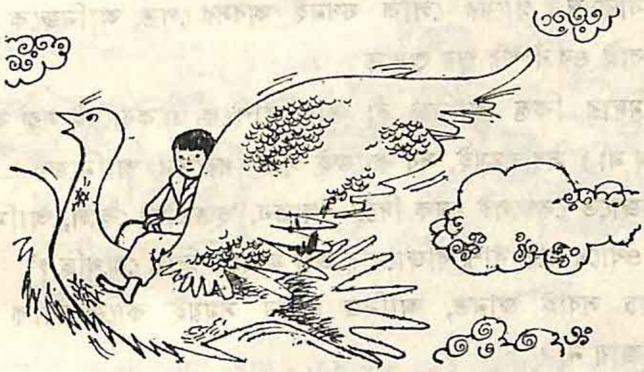
অন্ধ ওয়াংজিয়া মাটি হাতড়ে হাতড়ে হামা দিয়ে আরো ন'শো মাইল এগিয়ে গেল। তারপর অনেক কষ্টে তুষারে ঢাকা পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় গিয়ে পৌঁছল। সেখানে পৌঁছে শুনতে পেল সেই সুখ-পাখির গলার স্বর।

—'বাছা, তুমি কি আমার জন্যই এখানে এসেছ?'

আনন্দে অধীর হয়ে ওয়াংজিয়া বলল, 'তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। শুধু আমি নয়, আমাদের গ্রামের সব মানুষ তোমাকে দেখার জন্য রাতদিন উন্মুখ হয়ে বসে আছে। অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে ফিরে যাবে তুমি?'

সুখের পাখি নিজের নরম দুটি ডানা বুলিয়ে আদর করল ওয়াংজিয়াকে। মিষ্টি সুরে গান শোনাল। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াংজিয়ার চোখের হারানো মণি দুটি আবার চোখের কোটরে ফিরে এল। আগের চেয়েও আরো পরিষ্কার দৃষ্টি ফিরে পেল সে। শরীরের সব ক্ষত মিলিয়ে গেল ওর। ফিরে পেল আগের চেয়েও বেশি শক্তি।

সুখের পাখি আদর করে ওয়াংজিয়াকে নানারকম খাবার খেতে



দিল। তারপর ওকে পিঠে করে উড়ে এলো ওদের গ্রামে। নামল এসে একটি পাহাড় চুড়োয়।

ওয়াংজিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সুখের পাখি, 'আমার কাছে কি চাও বল?'

ওয়াংজিয়া বলল, 'আমরা উত্তাপ আর সুখ চাই, অরণ্য আর পুষ্প চাই, শস্যক্ষেত আর নদী চাই।'

পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সুখের পাখি তিনবার জোরে ডেকে উঠল। প্রথম ডাকে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সোনালী সূর্য। আকাশ থেকে নেমে এল উষ্ণ বাতাস। দ্বিতীয় ডাকে মাইলের পর মাইল জুড়ে তৈরি হল অরণ্য। অরণ্য ভরে গেল ফুল আর নানা পাখির মিষ্টি গানে। আর তৃতীয় ডাকে বইতে শুরু করল নদী, দেখা দিল সবুজ ক্ষেত।

সেদিন থেকে সেই গ্রামের মানুষদের আর কোনদিন দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়নি। সুখের পাখি দিয়ে গেল তাদের চিরদিনের সুখ।

# রাখাল বালক আনিজ

কোন এক সময় এক জমিদারের আনিজ নামে এক রাখাল ছিল। বয়সে সে ছিল বালক। ওর স্বভাব চরিত্রের জন্য সবাই তাকে খুব ভালবাসত। সবচেয়ে ভালবাসত ওর বাঁশী শুনতে। বাঁশী মানে তো ছোট্ট এক টুকরো বাঁশ। কিন্তু আনিজের হাতে তাই হয়ে উঠত এক অপূর্ব বাদ্যযন্ত্র। গাঁয়ের লোক যখনই অবসর পেত, আনিজকে ঘিরে বসত সবাই ওর বাঁশীর সুর শুনতে।

জমিদার কিন্তু আনিজ বা তার বাঁশীকে একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। সব সময়ই, সব কাজেই খুঁত ধরতেন আনিজের। ওকে বাঁশী বাজাতে দেখলেই ধমক দিয়ে বলতেন, 'হতভাগা ছেলে, আমি কি তোকে ওখানে বসে বাঁশী বাজানোর জন্য মাইনে দিয়ে রেখেছি ?'

অথচ সবাই জানত, আনিজ কোন সময়ই কাজে ফাঁকি দিয়ে বাঁশী বাজায় না।

একদিন সামান্য একটা অজুহাতে জমিদার প্রচণ্ড প্রহার দিলেন আনিজকে। শুধু তাই নয়, গলা ধাক্কা দিয়ে ওকে বের করে দিলেন বাড়ি থেকে। আর বাঁশীটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিলেন। বললেন, 'দূর হয়ে যা। এবার দেখি কী করে আর বাজাস তুই ?'

আনিজ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ওকে এভাবে কাঁদতে দেখে এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি কে গো বাছা ? কি হয়েছে তোমার ? এভাবে কাঁদছ কেন ? তোমার মা-বাবা কোথায় ?'

আনিজ কাঁদতে কাঁদতেই সব কথা খুলে বলল, বৃদ্ধকে।

বৃদ্ধ ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'কেঁদ না, আনিজ। আমার সঙ্গে এসো। আমার কাছেই থাকবে তুমি। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব কি করে এর শোধ নেবে তুমি !'

আনিজকে উনি বাড়ি নিয়ে এলেন। বাঁশ কেটে নতুন একটা

বাঁশী বানিয়ে দিলেন। আগের বাঁশীটার চেয়েও সুন্দর হল বাঁশীটা। এবার শুধু মানুষ নয়, ওর বাঁশীর সুরে মোহিত হয়ে বনের পশুপাখিরাও হয়ে উঠল আনিজের প্রাণের বন্ধু।



এমনি করেই দিন যায়। একদিন সেই জমিদার সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের ছেলেদের ডেকে বললেন, 'কাল রাতে আমি স্বপ্নে অদ্ভুত সুন্দর একটি খরগোশ দেখেছি। দুধের মতো সাদা রঙ। মাথার ওপর ছোট্ট একটা কালো টিপ। আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে খরগোশটি। তোমরা আমাকে বন থেকে ঐ খরগোশটা ধরে এনে দাও।'

ছেলেরা বলল, 'বাবা, ওটা স্বপ্নই। আমরা জীবনে কখনও অমন খরগোশ দেখিনি বা অমন খরগোশ আছে বলেও শুনিনি। ও-খরগোশ আমরা কোত্থেকে আনব?'

জমিদার চটে গিয়ে বললেন, 'অপদার্থ সব! ঐ খরগোশই চাই আমি। তোমাদের ভেতর যে আমাকে ঐ খরগোশটা এনে দিতে পারবে, আমার মৃত্যুর পর আমার সব বিষয়-সম্পত্তি সে পাবে।'

বড় ছেলে মনে মনে ভাবল, 'আমি বাবার বড় ছেলে। বাবার মৃত্যুর পর ওঁর বিষয়-সম্পত্তির মালিক আমারই হবার কথা। কিন্তু অন্য ভাইদের কেউ যদি হঠাৎ ওরকম একটা খরগোশ ধরে আনে তাহলে তো সেই পেয়ে যাবে সব!'

এই কথা ভেবে, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বড় ভাই বেরিয়ে পড়ল খরগোশের সন্ধানে।

যেতে যেতে পথে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হল। তিনি সব শুনে বললেন, 'তাহলে তুমি বনে চলে যাও। সেখানে আনিজ আমার গরু চরাতে গেছে। ওকে গিয়ে বল তুমি কি চাও। ও তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।'

বড় ভাই সোজা বনে গিয়ে খুঁজে বের করল আনিজকে।

সব শুনে আনিজ বলল, 'আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করব। ওরকম বিচিত্র একটি খরগোশ যোগাড় করে রাখব আপনার জন্য। আজ বিকেলে এখানে এসে নিয়ে যাবেন খরগোশটা। কিন্তু খরগোশের দাম বাবদ হাজার টাকা নিয়ে আসবেন।'

শুনে মনে মনে হাসল বড় ভাই। পুরো বিষয়-সম্পত্তির তুলনায় হাজার টাকা কিছুই নয়!

সন্ধ্যার মুখে টাকা নিয়ে বনে এল বড় ভাই। এসে দেখল, একটা গাছের নিচে বসে আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছে আনিজ। বনের পশু-পাখিরা ওকে ঘিরে বসে আছে। কান খাড়া করে ওর বাঁশীর সুর শুনছে।

বড় ভাই সেই পশুদের ভেতর হঠাৎ দেখতে পেল সে-রকমই বিচিত্র একটি খরগোশ। দুধের মতো সাদা। মাথার ওপর একটা কালো টিপ।

খরগোশটাকে দেখতে পেয়েছিল আনিজও। বাঁশীটা মুখ থেকে নামিয়ে আনিজ হাত বাড়িয়ে খরগোশটাকে তুলে আনল। এনে বড় ভাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'এই নিন আপনার খরগোশ। ভাল করে ধরবেন। হাত থেকে পালিয়ে গেলে কিন্তু সে দায়িত্ব আমার নয়।'

বড় ভাই খুশি মনে টাকাটা আনিজের হাতে তুলে দিল। অনেক ধন্যবাদ জানাল ওকে। তারপর খরগোশটা নিয়ে রওনা হল বাড়ির পথে।

বন থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আবার কানে এল আনিজের বাঁশীর সুর। সেই সুর খরগোশটার কানে যেতেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠল

সেটা। এক লাফে বড় ভাইয়ের হাত থেকে মাটিতে পড়ে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল। হারিয়ে গেল বনের ভেতর।

সারা বন তন্নতন্ন করে খুঁজেও খরগোশটাকে না পেয়ে আবার আনিজের কাছে ফিরে এলো বড় ভাই। বলল, 'সাদা খরগোশটা পালিয়ে গেছে। কি করি বলতো ?'



আনিজ বলল, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম আপনাকে খরগোশটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে। এখন আর আমার কিছু করার নেই।'

অগত্যা বাড়ি ফিরে এল বড় ভাই। বাবাকে এসে সব কথা খুলে বলল। সব শুনে জমিদার খুব বকলেন বড় ছেলেকে।

মেজ ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'বাবা, মন খারাপ কর না। কাল আমি তোমাকে এনে দেব সেই সাদা খরগোশ।'

পরদিন মেজ ভাই বনে গেল খরগোশের খোঁজে। আনিজের সঙ্গে দেখাও হল। কিন্তু একই ঘটনা ঘটল তার বেলাতেও। মাঝখান থেকে আরো এক হাজার টাকা গচ্ছা গেল তার।

তৃতীয় দিন গেল জমিদারের ছোট ছেলে। কিন্তু সেই একই ঘটনা ঘটল। আরো এক হাজার টাকা লাভ হল আনিজের।

সব শুনে রাগে ফেটে পড়লেন জমিদার। বললেন, 'সব অপদার্থ, মূর্খের দল! কাল আমি নিজেই যাব সেই খরখোশ আনতে।'

পরদিন জমিদারবাবু নিজে বনে গেলেন আনিজের খোঁজে। জমিদারকে দেখে ঘৃণায় ভুরু কুঁচকে উঠল আনিজের। জমিদার আনিজের কাছে এগিয়ে এসে কিছু বলার আগেই আনিজ বাঁশীটা তুলে বাজাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে বন থেকে ছুটে এলো

খরগোশ, ভালুক, নেকড়ে, শিয়াল, সাপ আর নানা ধরনের পাখিরা। এসে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল জমিদারকে। ভয়ে জমিদারের মুখ শুকিয়ে গেল। থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন তিনি। আনিজের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, হাত-জোড় করে বললেন, 'বাঁচাও, দয়া করে আমাকে বাঁচাও বংশীবাদক।'

আনিজ বাঁশী নামিয়ে বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন? আমি সেই আনিজ, যাকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আপনি। আমার বাঁশীর একটি সুরে বনের এই পশুরা এই মুহূর্তে আপনাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলতে পারে।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জমিদার আনিজের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা কর আনিজ। তুমি যা চাইবে তোমাকে তাই দেব, শুধু আমাকে প্রাণে মের না।'

আনিজ বলল, 'বেশ, এবারের মতো ছেড়ে দিলাম আপনাকে। আমার নিজের জন্যে কিছুই চাই না আমি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, ভবিষ্যতে আর কোনদিন গরিবের ওপর কোন অন্যায় অত্যাচার করবেন না। আর গ্রামে ফিরে আপনার সম্পদের অর্ধেক বিলিয়ে দেবেন গরিব গ্রামবাসীদের ভেতর?'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জমিদার বললেন, 'তাই হবে আনিজ, তাই হবে। তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব আমি।'

জমিদারবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন। সত্যিই গ্রামে ফিরে এসে বিষয়-সম্পত্তির অর্ধেক তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন গরিব গ্রামবাসীদের ভেতরে। ভবিষ্যতেও আর কোনদিন কোন প্রজার ওপর অন্যায় অবিচার করেননি।

গ্রামের সবার কাছে এজন্য আনিজ আগের চেয়েও অনেক বেশি প্রিয় হয়ে উঠল।

## নক্সা-বোনা মেয়েটি

এক গ্রামে সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে ছিল। সুতো দিয়ে লেস্ বোনায় তার জুড়ি ছিল না। নানা রঙের সুতো দিয়ে সে এত সুন্দর পশু-পাখি-ফুলের নক্সা তুলত যে, দেখে মনে হত জীবন্ত সেগুলো। দূর-দূরান্ত থেকে লোক এসে নিয়ে যেত ওর হাতের কাজ। নিজেদের পোশাকে সেগুলো লাগিয়ে গর্ব করে বলত, 'এই দেখ, আমিও মেয়েটির হাতে বোনা একটি লেস্ পেয়েছি।'

এমনি করেই মেয়েটির নাম আর কাজের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দূর দূর থেকে অন্য গ্রামের মেয়েরা আসতে শুরু করল তার কাছে সেলাই শেখার জন্য। মেয়েটিও খুশি মনে তাদের নক্সা তোলা শিখিয়ে দিত। কিন্তু আর মেয়েরা যতই চেষ্টা করুক ওর মতো নক্সা তুলতে পারত না কেউ। মেয়েটি ওদের সান্ত্বনা দিয়ে বলত, 'ধৈর্য ধর, তোমরাও পারবে। তোমাদের সবাইকে আমার মতো নক্সা তোলা না শেখান পর্যন্ত আমিও হাল ছাড়ছি না।'



মেয়েটির এই সেলাইয়ের কথা একদিন দেশের রাজার কানে গিয়ে পৌঁছাল। মন্ত্রীদের ডেকে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'আমার রাজত্বে এমন গুণী ও রূপবতী মেয়ে আছে আমি জানতাম না তো? আগে আমাকে বলনি কেন তোমরা? এক্ষুনি ক'জন ঘোড়সওয়ার সৈন্য পাঠিয়ে দাও মেয়েটিকে নিয়ে আসার জন্য।'

রাজার আদেশে দশ ঘোড়সওয়ার সৈন্য তক্ষুনি রওনা হল মেয়েটিকে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু মেয়েটি সরাসরি অস্বীকার করে বলল, 'আমি এখন যেতে পারব না। মেয়েদের আমার মতো নক্সা তোলা শেখাচ্ছি আমি। সে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ জায়গা ছেড়ে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।'

একজন সৈন্য রেগে গিয়ে বলল, 'মহারাজ স্বয়ং তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন আমাদের। কোন্ সাহসে তাঁর আদেশ অমান্য করছ তুমি?'

মেয়েরা এসে ঘিরে দাঁড়াল মেয়েটিকে। বলল, 'না, ওকে তোমরা জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।'

কিন্তু ওদের কথা শুনবে কেন সৈন্যরা! তারা জোর করে মেয়েটিকে একটা পালকিতে তুলে নিল। মেয়েটি যেতে যেতেই পালকির ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার করে মেয়েদের বলে গেল, 'তোমরা মন খারাপ কর না। আমার যদি জীবন দিতে হয় তাও দেব, তবু তোমাদের নক্সা তোলা শিখিয়ে দেব আমি।'

মেয়েটিকে নিয়ে পালকি এসে রাজপ্রাসাদে থামল। রাজা নিজে এগিয়ে এলেন মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু মেয়েটি শক্ত হয়ে বসে রইল পালকির ভেতর। কিছুতেই নামতে রাজী হল না। বলল, 'আমি নামব না। আমাকে আমার পাহাড়-ঘেরা সেই ছোট্ট গাঁয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।'

রাজা বললেন, 'সে গাঁয়ে তুমি আর কোনদিনই ফিরে যেতে পারবে না। এখানেই থাকতে হবে তোমায়। নেমে এসো।'

মেয়েটি রাজী হল না নামতে। রাজা তখন আদেশ দিলেন মেয়েটিকে জোর করে পালকি থেকে নামিয়ে আনতে।

দাসীরা এসে টেনে নামাল ওকে পালকি থেকে। রাজা ওর হাত ধরে বললেন, 'এসো'।

মেয়েটি রেগে রাজার হাতে আচমকা এমন একটা কামড় বসিয়ে দিল যে, হাত দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল রাজার। রাগে অপমানে মহারাজ

আদেশ দিলেন, 'ওকে নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্দী করে রাখ।'

পরদিন রাজা কারাগারে গিয়ে মেয়েটিকে বললেন, 'আমাকে যদি বিয়ে কর তাহলে আজীবন তুমি সুখে থাকবে, যা তুমি কোনদিন ভাবতেও পার নি। বোকামি না করে আমাকে তুমি বিয়ে কর।'

মেয়েটি চটে গিয়ে বলল, 'না। আমি আমার নিজের গ্রামে ফিরে যেতে চাই। আমার গ্রাম আর বান্ধবীদের ছাড়া আর কাউকে আমি ভালবাসি না। মরে গেলেও এখানে থাকব না আমি।'

একথা শুনে প্রধান মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, এমন অবাধ্য মেয়েকে আপনার হত্যা করাই উচিত।'

রাজা রেগে গিয়ে বললেন, 'মেয়েটিকে অত দূর থেকে আনিয়েছি বিয়ে করার জন্য। ওকে হত্যা করার চেয়ে ভাল অন্য কোন পরামর্শ দেবার কথা মাথায় এল না আপনার।'

প্রহরীদের আদেশ দিলেন তিনি এই মুহূর্তে প্রধান মন্ত্রীর মাথা কেটে নেবার জন্য।

প্রহরীরা রাজার আদেশে প্রধান মন্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে রাজার আদেশ পালন করল।

অন্য মন্ত্রীরা প্রধান মন্ত্রীর এই দশা দেখে ভয়ে আর মুখ খুলতে সাহস পেল না। ভয়ে কাঁপতে লাগল তারা।

কিন্তু পরামর্শ তো কিছু দিতেই হবে রাজাকে! না হলে যদি সবার উপরই চটে যান উনি। তাই আর এক মন্ত্রী ভয়ে ভয়ে রাজার কাছে এগিয়ে এসে কানে কানে ওঁকে কিছু বললেন। শুনে খুশি হলেন রাজা।

পরদিনই আবার কারাগারে গেলেন রাজা। গিয়ে হেসে বললেন মেয়েটিকে, 'শুনেছি লেসে নক্সা তোলায় তোমার নাকি জুড়ি নেই। তোমার নক্সায় তোলা পশু পাখি দেখে মনে হয় যেন জীবন্ত! তুমি যদি সাত দিনের ভেতর আমাকে এমন একটি মোরগ বুনে দিতে পার, বোনা শেষ হলেই সেটি জীবন্ত হয়ে উঠবে, তাহলে তোমাকে আমি বাড়ি ফিরে যেতে দেব। নাহলে আমাকে বিয়ে করে আজীবন আমার কাছেই থাকতে হবে তোমায়।'

কাঁদতে কাঁদতে কারাগারে বসে সাতদিন সাতরাত সমানে সূঁচ-সুতো নিয়ে কাজ করে গেল মেয়েটি। সাত দিনের দিন শেষ করল সুন্দর একটি মোরগের নক্সা। নিজের আঙুল কামড়ে রক্ত বের করে একফোটা রক্ত ফেলল মোরগটির ঝুঁটির ওপর। মেয়েটির চোখের এক-ফোঁটা জল এসে পড়ল মোরগের ঠোঁটে। এক টুকরো মুক্তোর মতো সেটা লেগে রইল ঠোঁটের ফাঁকে। আর দেখতে দেখতে মোরগটি জীবন্ত হয়ে ডানা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল।

সকাল হতেই রাজা কারাগারে এলেন। মেয়েটির ঘরের ভেতর একটি জ্যান্ত মোরগকে ঘুরে বেড়াতে দেখে বললেন, 'অসম্ভব, এ তোমার নক্সার মোরগ হতেই পারে না। আমার প্রাসাদের কোন মোরগ চলে এসেছে এখানে। তবু তোমাকে আরো একবার সুযোগ দিচ্ছি সাত-দিনের ভেতর যদি আমাকে একটি জীবন্ত বুনো তিতির পাখির নক্সা বুনে দিতে পার তাহলে তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতে দেব। নাহলে আমাকে বিয়ে করে আজীবন আমার কাছেই থাকতে হবে তোমায়।'

শোনামাত্র মোরগটি শূন্যে লাফিয়ে উঠল। রাজার মাথার ওপর উড়ে এসে ডানা ঝাপটিয়ে বলল, 'বেচারা মেয়েটির জন্য আমার মায়া হচ্ছে! মিথ্যেবাদী রাজা, তোমাকে আমি ঘৃণা করি।'

শুনে প্রহরীরা ছুটে এলো মোরগটিকে ধরার জন্য। কিন্তু তার আগেই তীক্ষ্ণ নখে রাজার কপাল আঁচড়ে খামচে দিয়ে কারাগারের খোলা দরজা দিয়ে উড়ে পালিয়ে গেল মোরগটি।

নিজের কপাল চেপে ধরে রাগে কারাগার থেকে বেরিয়ে গেলেন রাজা। কপাল থেকে রক্ত ঝড়ে পড়ছে।

আবার কাঁদতে কাঁদতে বুনো তিতির পাখির নক্সা বুনতে বসল মেয়েটি। দিন নেই, রাত নেই কাজ করছে তো করছেই। সাত দিনের মাথায় মেয়েটি শেষ করল তিতির পাখির নক্সা। নিজের আঙুল কামড়ে রক্ত বের করে তিতিরের ডানার ওপর বুলিয়ে দিল। রঙীন হয়ে উঠল তিতিরের ডানা। মেয়েটির চোখের এক ফোঁটা জল এসে পড়ল তিতিরের ঠোঁটে। ঠিক যেন একটুকরো মুক্তো।

এবারও দেখতে দেখতে জীবন্ত হয়ে উঠল তিতির পাখিটি। ডানা নেড়ে উঠে দাঁড়াল।

আবার রাজা কারাগারে এলেন খোঁজ নিতে। মেয়েটির ঘরে এসে একটি তিতির পাখিকে ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াতে দেখে অবাক হলেন। কিন্তু সেটা গোপন করে বললেন, 'তুমি ভুল শুনেছ। আমি তোমাকে তিতির পাখির নক্সা তুলতে বলিনি। বলেছিলাম একটা ড্রাগনের নক্সা তুলতে। আরো সাতদিন সময় দিলাম তোমাকে। এর ভেতর যদি একটা ড্রাগনের নক্সা তুলে দিতে পার তাহলে তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতে দেব। নাহলে আমাকে বিয়ে করে আজীবন আমার কাছেই থাকতে হবে তোমায়।'

শোনা মাত্র বুনো তিতির পাখিটা ডানা ঝাপটিয়ে শূন্যে উঠে গেল। চীৎকার করে বলল, 'দুঃখী মেয়েটি কী কষ্টই না পাচ্ছে! এই অত্যাচারী রাজাকে ঘৃণা করি আমি।'

প্রহরীরা ছুটে এলো তিতিরটাকে মারার জন্য। কিন্তু তার আগেই তীক্ষ্ণ ঠোঁটে রাজার কাঁধে কয়েকবার কামড় বসিয়ে দিয়ে উড়ে পালিয়ে গেল তিতির।

রক্তে ভেসে গেল রাজার পোশাক। রাগে অপমানে ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।

আবার কাঁদতে কাঁদতে ড্রাগনের নক্সা বুনতে বসল মেয়েটি। সাত দিন সাত রাত পরিশ্রম করে তৈরি করল একটি ড্রাগনের নক্সা। নিজের আঙুল কামড়ে রক্ত বের করে ড্রাগনটিকে লাল করে দিল। ওর চোখের এক ফোঁটা জল ড্রাগনের মুখে পড়ে মুক্তোর মতো জ্বলতে লাগল।

দেখতে দেখতে শরীরে একটা মোচড় দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল ড্রাগনটা।

আদর করে ড্রাগনের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল মেয়েটি, 'লাল ড্রাগন, তুমি প্রাণ পেয়েছ বটে, কিন্তু তাতেও আমার ভাগ্য ফিরবে না। রাজা ঠিক এসে বলবেন, উনি ড্রাগনের নক্সা তুলতে বলেন নি। উনি চেয়েছিলেন একটা মাছের নক্সা। এইভাবে আমাকে প্রতারণা করবেন

উনি। আমাকে কোন দিনই বাড়ি ফিরে যেতে দেবেন না।'

সাতদিন পর আবার কারাগারে এলেন রাজা। মেয়েটির ঘরে এসে একটি জ্যান্ত লাল ড্রাগন দেখে ভয়ে চমকে উঠলেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ড্রাগন কোথায় এটা একটা সাপ দেখছি!'



শুনে রাগে গর্জন করে উঠল ড্রাগন। মুখ থেকে একটা আগুনের গোল্লা বের করে ছুঁড়ে দিল রাজার দিকে। তাতে পুড়ে মারা গেলেন রাজা, মন্ত্রী ও প্রহরীরা। গোল্লাটা গড়াতে গড়াতে কারাগারের বাইরে গিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিল গোটা রাজপ্রাসাদ।

তারপর মেয়েটিকে পিঠে তুলে নিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল ড্রাগনটি। মেয়েটি আকাশে গিয়েও কিন্তু তার নক্সা বোনার কাজ করে যেতে লাগল। আকাশে কখনও যদি সাত রঙের রামধনু দেখ তাহলে নিশ্চয়ই জানবে, এটি সেই মেয়েটির হাতে বোনা অপূর্ব এক রঙীন নক্সা।

# মা লিয়াংয়ের যাদু-তুলি

অনেক দিন আগে মা লিয়াং নামে একটি ছেলে ছিল। মা বাবা কেউ ছিল না তার। বন জঙ্গল পাহাড় থেকে জ্বালানি কাঠ আর বুনো লতাপাতা তুলে এনে বিক্রি করে দিন চলত তার।

ছেলেটি ছিল খুব বুদ্ধিমান। আর ভীষণ শখ ছিল তার ছবি আঁকার। কিন্তু এমনই গরিব ছিল যে, একটি তুলি কেনারও পয়সা ছিল না।

একদিন একটা স্কুলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ নজরে পড়ল, ভেতরে বসে একজন শিক্ষকমহাশয় একমনে একটি রঙীন ছবি আঁকছেন। ও নিজেও জানে না, সব ভুলে ছবিটা দেখতে দেখতে কখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ছবিটার সামনে।

শিক্ষকমশায় একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কি চাই?'

ভয়ে ভয়ে বলল মা লিয়াং, 'আমার খুব ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে। দয়া করে আমাকে একটা তুলি দেবেন?'

শুনে চটে গেলেন শিক্ষকমশায়। বললেন, 'কি বললি? তোর মত একটা ভিখিরি ছেলে ছবি আঁকা শিখবি? ভাগ এখান থেকে।'

ফিরে আসতে আসতে মা লিয়াং নিজের মনেই ভাবল, 'গরিব বলে কি আমি ছবি আঁকাও শিখতে পারব না?' মনে খুব জোর ছিল ওর। তাই ঠিক করল, 'কেউ না শেখাক, আমি নিজেই ছবি আঁকা শিখব।'

পরদিন থেকেই রোজ ও ছবি আঁকতে শুরু করল। কি দিয়ে আঁকত? পাহাড়ে কাঠ কুড়োতে গিয়ে কাঠের টুকরো দিয়ে মাটিতে আঁকত পাখি। নদীর পাড়ে লতাপাতা তুলতে গেলে জলে আঙুল ডুবিয়ে বালুর ওপরে আঁকত মাছ। যে গুহাতে বাস করত তার দেয়ালে আঁকত আসবাবপত্র।

এমনি করেই চলছিল ওর ছবি আঁকার চর্চা। যারা ওর ছবি দেখত

তারাই বলত, 'বাঃ! দেখে মনে হয় যেন জীবন্ত।' কিন্তু মা লিয়াং ভাবত, 'আহা, আমার যদি একটা তুলি থাকত, তাহলে আরো কত সুন্দর ছবি আঁকতে পারতাম আমি।'

একদিন রাতে ছবি আঁকতে আঁকতে ক্লান্ত হয়ে ছবির পাশেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মা লিয়াং। হঠাৎ মনে হল, ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক বৃদ্ধ। মুখে লম্বা সাদা দাড়ি। ওর হাতে সুন্দর একটা তুলি দিয়ে বললেন,'মা লিয়াং, এটা একটা যাদু-তুলি। খুব সাবধানে ব্যবহার ক'র।'

তুলিটা হাতে নিয়ে মা লিয়াং অবাক! কী সুন্দর একটা সোনার তুলি! চোখ তুলে বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানাতে যাবে, হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

ঘুম ভেঙে গেল মা লিয়াংয়ের। উত্তেজনায় উঠে বসল। তাহলে কি ও স্বপ্ন দেখছিল? কিন্তু স্বপ্নই বা হবে কি করে? হাতের মুঠে যে ওর সেই যাদু-তুলিটা!

হাতের সামনে রং ছিল। রঙে তুলি ডুবিয়ে একটা পাখি আঁকল মা লিয়াং। আশ্চর্য! পাখিটা হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ডানা ঝাপটে আকাশে উড়ে গেল। ঘুরে ঘুরে মিষ্টি সুরে গান শোনাতে লাগল মা লিয়াংকে।

পরদিন থেকেই গাঁয়ের গরিবদের জন্য মা লিয়াং ওর যাদু-তুলি দিয়ে আঁকতে শুরু করল লাঙল, কাস্তে, বালতি, ঝুড়ি, তেলের বাতি। আর বিলিয়ে দিতে লাগল গরিবদের ভেতর।

কিন্তু খুব বেশিদিন একথা গোপন থাকল না। একদিন ওর যাদু-তুলির কথা গিয়ে পৌঁছাল গ্রামের জমিদারের কানে। তিনি পাইক পাঠালেন মা লিয়াংকে ধরে আনার জন্য। তারপর মা লিয়াং এলে ওকে বললেন ওঁর নিজের শখের কিছু জিনিস এঁকে দেবার জন্য।

গরিব প্রজাদের ওপর জমিদারের অন্যায় অবিচার অত্যাচার এতদিন নিজের চোখে দেখে এসেছে মা লিয়াং। তাই জমিদারের জন্য ছবি আঁকতে কিছুতেই রাজী হল না সে।

জমিদার দারুণ চটে গিয়ে ওকে একটা আস্তাবলে বন্দী করে রাখলেন। হুকুম দিলেন, ছেলেটাকে যেন কিছু খেতে না দেওয়া হয়।

দিন তিনেক পর একদিন রাতে শুরু হল ভীষণ তুষারপাত। জমিদার মনে মনে এতে খুশি হলেন। ভাবলেন, উপোস করে যদি নাও মরে এবার ঠাণ্ডাতেই মরে যাবে ছেলেটা।

নিজের চোখে একবার দেখার জন্য আস্তাবলে গেলেন তিনি। দূর থেকেই দরজার ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো এসে বাইরে পড়েছে দেখে একটু অবাক হলেন। কাছে গিয়ে দরজার ফাঁকে চোখ রেখেদেখেন,একটা বড় চুল্লির সামনে বসে মহা আনন্দে গরম গরম কেক খাচ্ছে মা লিয়াং। বুঝতে পারলেন, এসবই ওর যাদু-তুলিতে আঁকা জিনিস। রাগে কাঁপতে কাঁপতে জমিদার ওঁর পাইকদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে আদেশ দিলেন, 'এক্ষুনি হত্যা কর ঐ মা লিয়াংকে। কেড়ে আন ওর যাদু-তুলি।'

পাইকরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে অবাক। কোথায় মা লিয়াং! ঘর ফাঁকা। ঘরের দেয়ালে লাগানো বিরাট একটা মই। জমিদার বুঝলেন, যাদু-তুলিতে মইটা এঁকে এটায় উঠেই পালিয়েছে ছেলেটা। ওকে ধরার জন্য ছুটে গিয়ে মইয়ে উঠতে শুরু করলেন জমিদার। কিন্তু কয়েক ধাপ উঠতেই ধপাস্ করে নিচে গড়িয়ে পড়লেন। অবাক হয়ে দেখলেন, মইটা আবার দেওয়ালে আঁকা মইয়ের ছবি হয়ে গেছে!

জমিদারের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে মনে মনে ভাবল মা লিয়াং, 'আমার পক্ষে আর এ গ্রামে লুকিয়ে থাকা সম্ভব হবে না। আমাকে যে আশ্রয় দেবে তার উপরই অত্যাচার করবেন জমিদার। তাই এখান থেকে দূরে কোথাও পালিয়ে যাওয়াই ভাল।'

যাদু-তুলি দিয়ে একটা সুন্দর ঘোড়া আঁকল মা লিয়াং। দেখতে দেখতে ঘোড়াটা জীবন্ত হয়ে উঠল। মা লিয়াং ঘোড়ায় চেপে গ্রামের বন্ধুদের হাত নেড়ে বলল, 'বিদায়, বন্ধুরা।'

বলেই ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল সে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই পেছনে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখে, জমিদার ঘোড়সওয়ার প্রহরীদের নিয়ে ছুটে আসছেন ওকে ধরার জন্য। ওরা কাছে আসতেই যাদু-তুলিতে একটা ধনুক ও তীর

আঁকল মা লিয়াং। তারপর তীর ধনুক তুলে ধরল জমিদারকে লক্ষ্য করে।

মুহূর্তে ছুটে গেল ওর হাতের তীর। সোজা গিয়ে গেঁথে গেল জমিদারের বুকে। ঘোড়া থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন জমিদার। মনিবের ঐ দশা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল ওঁর সঙ্গীরা।



সাতদিন সমানে ঘোড়া ছুটিয়ে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, একদিন এক নতুন শহরে এসে পৌঁছল মা লিয়াং। ঠিক করল এখানেই থাকবে সে।

পরদিন থেকেই ছবি এঁকে বাজারে বিক্রি করতে শুরু করল মা লিয়াং। এতে পয়সাও পেতে শুরু করল। কিন্তু প্রথম থেকেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল সে। কোন ছবি যাতে জীবন্ত হয়ে না ওঠে তাই কোন ছবিই পুরো আঁকত না। পাখি আঁকত কিন্তু ঠোঁট দিত না। পশু আঁকত কিন্তু একটি পা বাদ দিয়ে।

এমনি করেই দিন কাটছিল। কিন্তু একদিন বাজারে বসে একটা চোখবিহীন সারস এঁকে মাথায় রং বোলাতে গিয়ে হঠাৎ চোখের

জায়গায় তুফোঁটা কালি পড়ে গেল। চোখ ফিরে পেতেই সারসটা হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল। যারা দাঁড়িয়ে ছবি-আঁকা দেখছিল তারা তো অবাক। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল ঘটনাটা নিয়ে।

খবরটা রাজ্যের সম্রাটের কানে গিয়েও পৌঁছল। সৈন্য পাঠিয়ে মা লিয়াংকে প্রসাদে নিয়ে এলেন সম্রাট। পরীক্ষা করার জন্য বললেন, 'আমাকে একটা ড্রাগন এঁকে দাও তো।'

এদেশে পা দিয়েই শুনেছিল মা লিয়াং যে সম্রাট খুবই অত্যাচারী। ওর অত্যাচারে গরিব প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মনে মনে তাই প্রতিজ্ঞা করেছিল সম্রাটের কোন আদেশই পালন করবে না।

সম্রাট ওকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমক দিয়ে বললেন, 'কি হল, আঁক!'

মা লিয়াং ড্রাগনের বদলে একটা হোঁৎকা ব্যাঙ আঁকল। সম্রাট রেগে গিয়ে বললেন, 'এটা কী হয়েছে ? বেশ, ড্রাগন আঁকতে না পারলে একটা ফীনিক্‌স্ পাখি আঁক তো ?'

মা লিয়াং আঁকল একটা বিশ্রী মোরগ। হোঁৎকা ব্যাঙ আর কদাকার মোরগটা জীবন্ত হয়ে গোটা প্রাসাদ জুড়ে লাফাতে আর ডানা ঝাপটে উড়ে বেরাতে শুরু করল। বিশ্রী গন্ধ আর নোংরায় ভরে গেল চারদিক।

দেখে রাগে ফেটে পড়লেন সম্রাট। আদেশ দিলেন, 'ছেলেটার হাত থেকে তুলিটা কেড়ে নিয়ে ওকে কারাগারে বন্দী করে রাখ।'

প্রহরীরা তাই করল। যাদু-তুলিটা হাতে পেয়ে সম্রাট নিজেই আঁকতে শুরু করলেন। প্রথমে আঁকলেন অনেকগুলো সোনার পাহাড়। দেখতে দেখতে সেগুলো সত্যি পাহাড় হয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সম্রাটের পায়ের কাছে। কেননা পাহাড়ের মাথাগুলো হয়ে গিয়েছিল প্রচণ্ড ভারী। আর ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনার পাহাড়ের টুকরোগুলো হয়ে গেল পাথরের টুকরো।

সম্রাটের লোভ তখনও যায়নি। এবার তাই বিরাট লম্বা একটা

সোনার দণ্ড আঁকলেন। দেখতে দেখতে সেটা হয়ে গেল বিশাল একটা অজগর সাপ। বিরাট হাঁ করে ছুটে এল সম্রাটের দিকে। সম্রাটের প্রহরীরা দৌড়ে এসে কোন রকমে বাঁচাল সম্রাটকে।

সম্রাট বুঝতে পারলেন এই যাদু-তুলি দিয়ে কিছু আঁকার ক্ষমতা ওঁর নেই। তাই মা লিয়াংকে কারাগার থেকে মুক্ত করে নিজের কাছে নিয়ে এলেন আবার। মিষ্টি কথায় ওকে ভুলিয়ে অনেক টাকাকড়ি সোনাদানা উপহার দিলেন। কথা দিলেন, নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন ওর। তারপর যাদু-তুলিটা মা লিয়াংকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাকে প্রথমে সুন্দর একটা সমুদ্র এঁকে দাও তো ভাই?'

মা লিয়াং মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল কি করবে সে। তবু সম্রাটের কথা মত তুলির টানে বিশাল একটা সমুদ্র আঁকল। আঁকল সুন্দর রামধনু-রংয়ের একরাশ মাছ। কাঁচের মত টলটলে সমুদ্রের জলে নিজেদের মনে খেলে বেড়াতে লাগল মাছগুলো। খেলতে খেলতে অনেকদূরে চলে গেল।

সম্রাট উত্তেজিতভাবে বললেন, 'মা লিয়াং, শিগগির আমাকে একটা নৌকো এঁকে দাও। সেই নৌকায় চড়ে আমি মাছগুলোর পেছন পেছন যাব ওদের দেখতে।'

বিরাট একটা নৌকো এঁকে দিল মা লিয়াং। সম্রাট সম্রাজ্ঞী, রাজ-পুত্র, রাজকন্যা ও নিজের কিছু তাঁবেদার কর্মচারীদের নিয়ে নৌকায় উঠে বসলেন।

নৌকোটা খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে দেখে সম্রাট দূর থেকেই চীৎকার করে বললেন, 'মা লিয়াং, আরো জোর বাতাস চাই। নৌকো বড় আস্তে যাচ্ছে।'

মা লিয়াংয়ের যাদু-তুলিতে ছবিতে কতগুলো রংয়ের পোঁচ পড়ল। উঠল বাতাস। ঢেউ উঠল সমুদ্রে। মাঝ সমুদ্রের দিকে ছুটতে শুরু করল নৌকা। ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন সম্রাট, 'এবার থাম, মা লিয়াং। আর বাতাসের দরকার নেই।'

কিন্তু মা লিয়াং যেন শুনতেই পেল না সে কথা। ছবিতে আরো

রংয়ের পোঁচ পড়ল। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। উঠল ঝড়। উত্তাল হয়ে উঠল সমুদ্র। নৌকার উপর এসে আছড়ে পড়তে লাগল বিশাল ঢেউ। আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল নৌকার যাত্রীরা, 'বাঁচাও, বাঁচাও।'

আরো কিছু পোঁচ পড়ল ছবিতে। গর্জে উঠল সমুদ্র। ঝড়ের দাপটে মাঝ সমুদ্রে উল্টে গেল নৌকাটা। ভেঙে খানখান হয়ে গেল। সমুদ্রে তলিয়ে গেল সম্রাট আর তাঁর সঙ্গীরা।

সম্রাটের মৃত্যুর পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল মা লিয়াং ও তার যাদু-তুলির কথা। প্রজারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল অত্যাচারী সম্রাটের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে।

আর মা লিয়াংয়ের কি হল? সে কথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারল না।

কেউ বলে, সে আবার নিজের গ্রামে ফিরে গিয়েছিল তার চাষী ভাইদের কাছে।

কেউ বা বলে, না, এরপর মা লিয়াং সারা পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছিল গরিবদের জন্য ছবি এঁকে, তাদের দুঃখ দূর করার জন্য।

## সোনার মাছ

এক গ্রামে এক জেলে ছিল। মাছ ধরেই সে সংসার চালাত। একদিন মাছ ধরার সময় তার জালে ধরা পড়ল এক সোনার মাছ। দেখে তো জেলে দারুণ খুশি! কিন্তু যেই না জাল থেকে মাছটা বের করার জন্য হাত বাড়িয়েছে, মাছটা হঠাৎ তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে আবার গিয়ে জলে পড়ল।

জেলে দারুণ মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে এল। সারাটা পথ ওর চোখের সামনে ভাসছিল শুধু পালিয়ে যাওয়া সোনার মাছটা।
এর পর থেকে রোজই সে নদীতে গিয়ে জাল ফেলত। প্রচুর মাছও পেত। কিন্তু সোনার মাছটা আর কোনদিনই ধরা পড়ল না ওর জালে।

এমনি করেই তিন বছর কেটে গেল। মাছ বিক্রি করে প্রচুর টাকা হল তার। সেই টাকায় অন্যখানে গিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করল সে। মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিল। কিন্তু সেই চোখ-ভোলানো সোনার মাছটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারল না জেলে।

কিছুদিন পর জেলের প্রথম বৌ মারা যাওয়ায় আবার সে বিয়ে করল এক বিধবা মহিলাকে। সেই মহিলার আগের পক্ষের একটি ছেলে ছিল। বিয়ের পর ছেলেটিকেও সঙ্গে নিয়ে এল সে।

প্রথম প্রথম জেলে সেই ছেলেটিকে বেশ ভালবাসত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ছেলেটির প্রতি তার ভালবাসা কমতে শুরু করল। কেবলই মনে হত, ও তো আমার নিজের ছেলে না, ওর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

একদিন নদীর কাছে বেড়াতে গিয়ে জেলেদের মাছ ধরতে দেখে ছেলেটিরও সাধ হল মাছ ধরার। মনে পড়ল, বাড়িতে ঘরের কোণে বাবার একটা পুরোন জাল ঝুলিয়ে রেখেছে মা।

দৌড়ে বাড়িতে এসে মা'কে বলল সে, 'মা, জালটা তো পড়েই আছে, ওটা দাও না আমাকে। মাছ ধরে আনি।'

মা শুনে বলল, 'সে কি কথা! তুই এইটুকু ছেলে জাল দিয়ে মাছ ধরবি? না না, শেষে একটা বিপদ ঘটিয়ে বসবি।

কিন্তু ছেলেটি এমন বায়না ধরল যে, শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল মাকে।

জাল নিয়ে এক দৌড়ে আবার নদীর পাড়ে এল ছেলেটি। নদীতে জাল ফেলতেই জালে ধরা পড়ল একটা সোনার মাছ। মাছটা নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াতেই হঠাৎ মনে হল, 'মাছটা নিয়ে কী করা যায়? এটাকে বেচে দেব, না, রান্না করে নিজেরাই খাব?'

একটু থেমে মাছটা আবার চোখের সামনে তুলে ধরল। ভাল করে দেখে এবার মায়া হল ওর। মনে মনে ভাবল, 'আহা! এমন সুন্দর একটা মাছকে হত্যা করাটা খুবই নিষ্ঠুরতা হবে। তার চেয়ে বরং ছেড়েই দিই এটাকে।'

আবার নদীর কাছে ফিরে এল ছেলেটি। মাছটাকে নদীর জলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'যা, তোকে মুক্তি দিলাম।'



অন্য কয়েকটি ছেলে তখন নদীর পাড়ে খেলছিল। ওরা ছেলেটার কাণ্ড দেখে ওর সৎ-বাবা সেই জেলেকে এসে বলল, 'আপনার ছেলে

একটা সোনার মাছ ধরেছিল, কিন্তু সেটাকে আবার নদীতে ছেড়ে দিল। কেন বলুন তো?'

শুনে জেলে দারুণ রেগে গেল। মনে মনে ভাবল, 'গত আট বছর ধরে আমি সেই সোনার মাছের স্বপ্ন দেখছি। হতভাগা সেটাকে ধরেও ছেড়ে দিল? ঐ মাছটা পেলে রাতারাতি আমরা বড়লোক হয়ে যেতে পারতাম।'

বাড়ি ফিরে একটা ছোট তরোয়াল টেনে নিয়ে ছেলের চুলের মুঠি ধরে বলল জেলে, 'সোনার মাছটা ধরেও আবার জলে ছেড়ে দিয়েছিস কেন?'

আতঙ্কে ছেলেটা তুই পা পিছিয়ে গেল। এতে আরো চটে গেল জেলে। তরোয়ালটা ওর বুকের সামনে তাক করে চীৎকার করে বলল, 'তোর মত একটা অপদার্থ ছেলের চেয়ে একটা সোনার মাছের দাম আমার কাছে অনেক বেশী। আজ তোকে খুনই করব আমি।'

মা ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে ছেলেকে এসে জড়িয়ে ধরল। স্বামীকে বলল, 'তুমি এত নিষ্ঠুর? একটা মাছের জন্য আমার ছেলেটাকে খুন করতে চাও তুমি? ছিঃ।'

জেলে বলল, 'সে তুমি বুঝবে না। ওকে ছেড়ে দাও। নিজের হাতে ওকে আজ খুন করব আমি।'

অনেক কাকুতিমিনতি করেও স্বামীকে শান্ত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মা বলল, 'বেশ তাই যদি হয়, অন্তত রাত হতে দাও। দিনের বেলা ওকে খুন করলে সবাই জেনে যাবে। তোমারও ফাঁসি হবে। রাতের অন্ধকারে ওকে খুন করলে কেউ জানতে পারবে না।'

জেলে ভেবে দেখল কথাটা মিথ্যে নয়। তাই বউয়ের কথায় রাজী হল।

মা ছেলেকে নিয়ে ঘরে গেল। অনেক্ষণ মা ও ছেলে তু'জন তু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। তারপর এক সময় মা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। ছেলেকে গোপনে ঘরের বাইরে এনে কিছু খাবার একটা পোঁটলায় বেঁধে দিয়ে বলল, 'এক্ষুনি এখান থেকে পালিয়ে যা বাছা। যে দিকে

ছুচোখ যায় চলে যা। কোনদিন আর ফিরিস না এখানে।'

চোখের জল মুছে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ছেলেটি। তারপর হাঁটতে শুরু করল।

হাঁটছে তো হাঁটছেই। সকাল গড়িয়ে ছুপুর হল, ছুপুর গড়িয়ে রাত। এমনি করে ছুদিন পেরিয়ে গেল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ পথে বয়সে তরুণ একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হল ওর। দেখতে ভারী সুন্দর, শক্ত-পোক্ত চেহারা। তরুণ এগিয়ে এসে বলল ওকে, 'এমন একা একা কোথায় যাচ্ছ ভাই?'

ছেলেটি সব কথা খুলে বলল তরুণটিকে। সব শুনে তরুণটি বলল, 'ছুঃখ কর না ভাই। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হলে। এস আমরা কথা দিই, যত বিপদই আসুক, আমরা জীবনে কোনদিন কেউ কাউকে ছেড়ে যাব না! আমিও এ-পথেই যাচ্ছি, তুমি এস আমার সঙ্গে।'

ছেলেটি ভরসা পেয়ে তরুণটির সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল।

ছু'দিন পর ওরা একটা শহরে এসে পৌঁছল। শরীর ক্লান্ত। খিদায় পেট জ্বলে যাচ্ছে। ওরা জানত না সেই দেশের নিয়ম ছিল, কেউ কোন দোকানে খেয়ে পয়সা না দিলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পথে যেতে যেতে দোকানে থরে থরে খাবার সাজানো দেখে খিদে যেন আরো দশগুণ বেড়ে গেল ওদের।

ছেলেটি বলল, 'আমাদের কাছে পয়সা নেই, তাই কি উপোস করে থাকতে হবে?'

তরুণ ছেলেটি বলল, 'পয়সা নেই তো কি হয়েছে? আমরা খাওয়ার বদলে ওদের কোন কাজ করে দেব।'

একটা খাবার দোকানে গিয়ে ঢুকল ছু'জন। আশ মিটিয়ে খেল। দোকানী দাম চাইলে তরুণ বলল, 'আমাদের কাছে টাকা নেই। আমাদের কোন কাজ করতে দিন, গায়ে গতরে খেটে আমরা দাম শোধ করে দেব।'

দোকানী তাতে রাজী না হয়ে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল ওদের নামে। রাজা আদেশ দিলেন ছেলে ছুটিকে বন্দী করে আনার জন্য।

সৈন্যরা ওদের বন্দী করে আনলে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা খেয়ে দাম দাও নি কেন ?'

তরুণ বলল, 'আমরা পরদেশী পথিক। আমাদের সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। খাবার বদলে আমরা গায়ে গতরে খেটে দিতে রাজী আছি।'

রাজা বললেন, 'তা হয় না। আমি আইন করে দিয়েছি, কেউ খাবারের দাম না দিলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।' বলেই রাজা হাঁক দিলেন, 'প্রহরী এক্ষুনি, এদের নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দাও।'

প্রধানমন্ত্রী শুনে এগিয়ে এসে বললেন, 'মহারাজ, আপনি অনুমতি দিলে একটা কথা বলতাম।'

রাজা বললেন, 'বল।'

প্রধানমন্ত্রী গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'মহারাজ, এই ছেলেদুটিকে দেখে মনে হচ্ছে ওদের সাহস, শক্তি আছে। আপনার কন্যাকে সাত বছর আগে এক ডাইনী ধরে নিয়ে গেছে। তারপর যাদেরই আপনি রাজকন্যাকে উদ্ধার করার জন্য পাঠিয়েছেন তাদের কেউ আর ফিরে আসেনি। সবাইকে সেই ডাইনী খেয়ে ফেলেছে। এই দুটি ছেলেকে একবার পাঠিয়ে দেখতে পারেন ওরা যদি রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে পারে তাহলে ওদের আপনি রাজদরবারে উচ্চপদে চাকরি দিতে পারেন। আর ওদের যে কোন একজনের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিতে পারেন। ওরা যদি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে তাহলে তখন ওদের ফাঁসি দেবার সুযোগ তো আপনার থাকলই।'

প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে একটু চিন্তা করলেন মহারাজ। ভেবে দেখলেন, মন্ত্রীমশায় ঠিক কথাই বলেছেন। তাই ছেলে দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার একমাত্র মেয়েকে এক ডাইনী ধরে নিয়ে গেছে। তোমরা যদি তাকে উদ্ধার করে আনতে পার তাহলে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাবে এবং তোমাদের যে কোন একজনের সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ে দেব আমি। তোমরা রাজী এতে ?'

দু'জনেই মাথা নেড়ে বলল, 'আমরা রাজী, মহারাজ।'

রাজা ওদের একটি করে বাঁকা তরোয়াল আর তেজী ঘোড়া দিলেন। ওরা দু'জন ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল রাজপ্রসাদ থেকে।

দুদিন চলার পর হঠাৎ দেখল ওরা, ওদের পথরোধ করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে খাড়া, বিশাল উঁচু এক পাহাড়। ঘোড়াদুটোকে পাহাড়ের নিচে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে ওরা পায়ে হেঁটে ওপরে উঠতে লাগল পাহাড়-চুড়োয় পৌঁছানোর জন্য। একটু এগিয়েই নিচের দিকে তাকিয়ে ওদের নজরে পড়ল সুন্দর একটি সোনালী বাড়ি। পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীর ওপর একটা সেতু।

হঠাৎ সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল এক ডাইনী বুড়ি। চীৎকার করে বলল সে, 'কে তোরা? কোন সাহসে এসেছিস এখানে? মরার সাধ হয়েছে, না?'

চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। লকলকে জিভটা বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে। যেন এই মুহূর্তে ছেলেদুটোকে গিলে ফেলবে।

ছেলেদুটি কিন্তু এতে একটুও ভয় পেল না। কোমর থেকে তরোয়াল টেনে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

হোহো করে হেসে উঠল ডাইনী। বলল, 'তোদের মত হাজারটা ছেলে এলেও রাজকন্যাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবি না। তোরা তো নিতান্ত শিশু। তোদের রাজা প্রতিবছর কয়েক হাজার করে সৈন্য পাঠায় রাজকন্যাকে উদ্ধার করার জন্য। তাদের কি দশা করেছি দেখ। যে পাহাড়ের উপর তোরা দাঁড়িয়ে আছিস সেই পাহাড় তৈরি হয়েছে সেই সব সৈন্যদের হাড়ে। তোদের মত পুঁচকে দুটো ছেলেকে তো আমি এক গ্রাসে গিলে ফেলতে পারি।'

ডাইনীর কথা শেষ হবার আগেই ছোট ছেলেটি তরোয়াল নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল ডাইনীর দিকে। ডাইনী এক বিরাট ফুঁ দিল। সেই ফুঁয়ে ছেলেটির হাত থেকে শূন্যে উড়ে গেল ওর তরোয়াল।

চোখের নিমেষে তরুণ ছেলেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাইনী বুড়ির ওপর। তরোয়ালের এক কোপে ওর মাথাটা দু'টুকরো করে ফেলল। ফোয়ারার মত রক্ত বেরিয়ে এল ডাইনীর দেহ থেকে।

ছেলেদুটি নদীর পাড়ে গেল তরোয়াল দুটি ধুয়ে নিতে। এমন সময় সোনালী বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে। ছেলেদুটিকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'তোমরা দুই বীর এখানে কোত্থেকে এলে? এখানে তো কেউ আসতে পারে না।'

ছোট ছেলেটি বলল, 'রাজকন্যাকে এক ডাইনী এখানে ধরে এনেছে। আমরা তাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

মেয়েটি বলল, 'আমিই সেই রাজকন্যা। তোমরা শিগগির এখান থেকে পালিয়ে যাও। ডাইনী তোমাদের দেখতে পেলে হত্যা করবে তোমাদের।'

ওরা দূরে ডাইনীর মৃতদেহটা দেখিয়ে রাজকন্যাকে বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই। ঐ দেখ, ডাইনীকেই হত্যা করেছি আমরা।'

রাজকন্যা দেখে অবাক! বলল, 'সত্যিই তোমরা অসাধারণ বীর। কিন্তু এখনও তোমাদের বিপদ কাটেনি। ঐ ডাইনীটার দুটি ছেলে আছে। চল্লিশ দিনের জন্য তারা বাইরে গিয়েছে। আজই তাদের ফেরার দিন।'

ছেলে দু'টি রাজকন্যাকে অভয় দিয়ে বলল, 'ভয় পেও না রাজকুমারী, ওদের শায়েস্তা করার ক্ষমতাও আমাদের আছে।' তারপর ছোট ছেলেটিকে বলল, 'তুমি এই বাড়ি আর রাজকন্যাকে পাহারা দাও। আমি ঐ সেতুর মুখে গিয়ে অপেক্ষা করছি।

একটু পরেই ডাইনীর দুই ছেলে, কালো-দৈত্য আর সাদা-দৈত্য ফিরে এল। দূর থেকেই মানুষের গন্ধ পেয়ে ওরা চীৎকার করে বলল, 'বাড়ির ভেতর কারা আছ? বেরিয়ে এস।'

তরুণ ছেলেটি এক লাফে সেতুর পাশ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'আমরা রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে এসেছি। বাধা দিলে তোদের কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব।'

সাদা দৈত্য তার বিশাল লম্বা বল্লমটা তরুণের বুকের সামনে তুলে ধরে বলল, 'দাঁড়া, তোর বড়াই করা বের করছি।'

তরুণ একটুও ভয় পেল না। চোখের নিমেষে বল্লমটা চেপে ধরে মট

করে ভেঙে ছুটুকরো করে দিল। কালো-দৈত্য দেখে ভয় পেয়ে গেল। ওর বিশাল লোহার হাতুড়িটা তুলে ছুটে এল তরুণের দিকে। তরুণ নির্ভয়ে তরোয়ালটা দিয়ে এক আঘাতে হাতুড়িটা তু'টুকরো করে দিল। তারপর তুই ভাইকেই হত্যা করে তাদের কাটা মাথাতুটো ঝুলিয়ে রাখল সেতুর ওপর।

এতক্ষণ ছোট ছেলেটি আর রাজকন্যা বাড়ির ভেতর থেকে দেখছিল সব। ছেলেটি এবার ছুটে এসে আনন্দে জড়িয়ে ধরল ওর তরুণ সঙ্গীকে। তারপর ওরা রাজকন্যাকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ছুটে চলল রাজধানীর দিকে।

তিনদিন পর ওরা রাজকন্যাকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলে মহারাজ ওদের দেখে অবাক। ভাবছেন, এ কি সত্যি, না স্বপ্ন! ছুটে এসে তিনি



মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ছেলে তুটিকে বললেন, 'আমার কথা রাখব আমি। তোমাদের তু'জনকেই প্রচুর পুরস্কার দেব। আর তোমাদের যে কোন একজনের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেব আমি। এখন তোমরাই বল, কে বিয়ে করবে রাজকন্যাকে?'

তরুণ তার বন্ধুকে বলল 'আমার পক্ষে এখন বিয়ে করা সম্ভব নয়। কেন, তা পরে জানতে পারবে। তুমিই ওকে বিয়ে কর।'

বাধ্য হয়ে রাজী হতে হয় ছোট ছেলেটির। শুভদিন দেখে মহা ধুমধামের সঙ্গে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হয় ছোট জনের।

বিয়ের সাত দিন পর বন্ধু দু'জন রাজকন্যাকে নিয়ে দেশে ফেরার জন্য যাত্রা করল। মহারাজ ওদের দু'জনকেই প্রচুর সোনাদানা, খাবার সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

তিন দিন পর এক গ্রামে একটি নদীর সামনে এসে নদী পার হবার জন্য থামল ওরা। তরুণ সঙ্গীটি বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কেন রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাইনি সে কথা আজ বলব তোমাদের। তোমার মনে আছে, তোমার যখন পনের বছর বয়স ছিল তখন একদিন নদীতে জাল ফেলে কি ধরেছিলে তুমি?'

ছোট ছেলেটি বলল, 'একটি সোনার মাছ।'

—মাছটিকে কি করেছিলে তুমি?

—জলে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

তরুণ সঙ্গী বলল, 'তুমি খুবই দয়ালু। তাই সেদিন মাছটিকে হত্যা না করে আবার জলে ছেড়ে দিয়েছিলে তুমি। সেজন্য তোমার অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। আমিই সেদিনের সেই সোনার মাছ। তোমার কথা ভুলিনি বলেই তোমাকে সাহায্য করতে এসেছিলাম আমি। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার আমাকে বিদায় দাও বন্ধু।'

বলেই নদীতে ঝাপিয়ে পড়ল সে। আর একটু পরেই জল থেকে মাথা তুলল হাতে সোনার মাছ। বন্ধু আর রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথা নেড়ে আবার জলে ডুব দিল। মিলিয়ে গেল নদীর জলে।

# বাওবু ও শাজা

এক গ্রামে দুই বোন ছিল। মা বাবা দু'জনেই একসঙ্গে মারা যাওয়ায় ওদের আর দেখার কেউ ছিল না। একদিন তাই দুই বোন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল আশ্রয়ের খোঁজে।

হাঁটছে তো হাঁটছেই। হাঁটতে হাঁটতে পেরিয়ে গেল পাহাড়, অরণ্য। খিদে পেলে খেত বনের ফল। পিপাসা পেলে ঝরনার জল।

একদিন এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে, যতদূর চোখ যায় সবুজ জমি। আর তারই ভেতর, পাহাড়ের নিচে, একটি বাড়ি।

দেখে আনন্দে দু'বোন ছুটে নেমে এল পাহাড় থেকে। এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। বাড়িটায় পৌঁছে দেখল, ঘরগুলো সুন্দর সব আসবাব-পত্রে সাজান কিন্তু সারা বাড়িটায় একটিও লোক নেই।

এ ক'দিন পথে শুধু বুনো ফল আর জল খেয়ে থাকায় খুবই ক্ষুধার্ত ছিল ওরা। ভাল কিছু খাবার জন্য মনটা আনচান করছিল। বড় বোন তাই সোজা রান্নাঘরে ছুটে গেল খাবারের খোঁজে। গিয়ে দেখল টেবিলের উপর একটি কাঠের প্লেট ভর্তি টাটকা সবুজ মটরদানা। মুঠো মুঠো করে সেগুলো খেয়ে ফেলল সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছোট বোনও গিয়ে হাজির হল রান্নাঘরে। খাবার আলমারিটা খুলে তার ভেতর দেখতে পেল একটি কাঠের প্লেট ভর্তি টাটকা লাল মটর দানা। দিদির মত সেও খেয়ে ফেলল মটরদানা-গুলো।

আর আশ্চর্য! কয়েকদিনের ভেতরই দুই বোনেরই দুটি মেয়ে হল। বড় বোনটি তার মেয়ের নাম রাখল বাওবু আর ছোট বোনটি তার মেয়ের নাম রাখল শাজা।

শাজার বয়স যখন সতের বছর তখন হঠাৎ একদিন ওর মা মারা গেল। সেই থেকে জেঠীমার আশ্রয়ে থাকল সে। কিন্তু জেঠীমা ওকে খুবই অবহেলা করত। খেতে দিত সবার ফেলে দেওয়া খাবার। পরতে দিত ছেঁড়া জামা-কাপড়। সংসারের কঠিন ভারী কাজগুলো সব করতে হত শাজারই।

একদিন গ্রামের শেষপ্রান্তে এক বিয়ে-বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গেল জেঠী নিজের মেয়ে বাওবুকে নিয়ে। যাব্বার আগে এক ধামা বাজরা আর জইয়ের দানা মিশিয়ে শাজাকে ডেকে বলল, 'আমি ফিরে আসার আগেই এগুলো বেছে আলাদা করে রাখবি। না হলে আজ রাতের খাওয়া বন্ধ তোর।'

বেচারী শাজা ধামার সামনে বসে কাঁদতে লাগল। এমন সময়, কোত্থেকে কে জানে, হঠাৎ এক বুড়ি এসে ওর পাশে বসল। মাথার



চুলগুলো সব ধব-ধব করছে সাদা। শাজার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল বুড়ি, 'বাছা, তুমি কাঁদছ কেন?'

শাজা বুড়িকে দেখে এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, ওর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। বুড়ি আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওদের সঙ্গে বিয়ে-বাড়িতে গেলে না কেন?'

শাজা চোখের জল মুছে বলল, 'আমার জেঠিমা যাবার আগে এই দানাগুলো বেছে আলাদা করে রাখতে বলে গেছে। না হলে আজ রাতে আমাকে উপোস করিয়ে রাখবে। তাছাড়া এই ময়লা ছেঁড়া পোশাক পরে আমি বিয়ে-বাড়িতে যাব কি করে?'

বুড়ি শাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'কেঁদ না, বাছা। আমার কথা

শোন। তোমাদের এই বাড়ির পেছনে যে সাদা ওক গাছটা আছে, ওর নিচে একটা ছোট্ট সুরঙ্গ আছে। সেই সুরঙ্গের ভেতর একটা দেবদারু কাঠের বাক্সে দেখবে প্রচুর জামা-কাপড়, মোজা ও জুতা আছে। সেগুলো পরে বিয়ে-বাড়িতে যাও তুমি। তোমার কাজটা আমি সেরে রাখছি।'

শাজা বুড়ির কথামত সেই গাছের নিচে গিয়ে দেখে সত্যিই তাই। সুরঙ্গের ভেতর বাক্স। বাক্স ভর্তি জামা, জুতো, মোজা। শাজা সেই বাক্স থেকে সুন্দর রঙীন একটি জামা ও লাল এক জোড়া জুতো বের করে পরল। তারপর খুশিতে যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে গিয়ে হাজির হল সেই বিয়ে-বাড়িতে।

এমনিতেই শাজা ছিল অপূর্ব সুন্দরী। নতুন রঙীন পোশাকে ওকে দেখতে এমন পরীর মত লাগছিল যে, ওর জেঠীও ওকে চিনতে পারল না।

বিয়ের উৎসব শেষ হতেই শাজার খেয়াল হল, জেঠীর আগেই তো ওকে বাড়ি পৌঁছতে হবে! তাই ছুটতে শুরু করল শাজা। ছুটতে ছুটতে পথে একপাটি জুতো পা থেকে খসে পড়ল। কিন্তু থেমে আর খোঁজার সময় নেই। এক পাটি জুতো পরেই যখন বাড়ি এসে পৌঁছাল তখন সারা শরীর ভিজে গেছে ওর ঘামে। আর বাড়ি এসে অবাক হয়ে দেখল, সেই বুড়ি নেই, কিন্তু শস্যের দানাগুলো বেছে আলাদা করে গুছিয়ে রেখে গেছে সে।

এদিকে এত ঘটনা ঘটে গেছে সে কথা জানতেও পারল না জেঠী।

পরদিন সকালে বুলোতুয়ো নামে এক যুবক শাজার হারানো লাল জুতোটি দেখতে পেল পথের পাশে। জুতোটা তুলে নিয়ে মনে মনে ভাবল সে, 'এত সুন্দর জুতো যে মেয়ের সেও নিশ্চয়ই খুবই সুন্দর। যেমন করে হোক তাকে আমি খুঁজে বের করব। আর এখনও যদি সে মেয়ের বিয়ে না হয়ে থাকে তাহলে তাকেই আমি বিয়ে করব।'

গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করল বুলোতুয়ো। কিন্তু কোথাও সে-মেয়ের সন্ধান পেল না। সবার শেষে এল সে শাজাদের

বাড়ি। লাল জুতোটা দেখিয়ে শাজার জেঠীকে বলল, 'এই জুতোটি যে মেয়ের তাকে খুঁজছি আমি। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। মেয়েটি কুমারী হলে তাকে আমি বিয়ে করতে চাই। দেখুন তো, জুতোটা চেনেন কিনা?'

বুলোতুয়োকে দেখেই বুঝতে পারল জেঠী, ছেলেটি বড় ঘরের ছেলে। নিজের মেয়ে বাওবুকে ডাকল তাই। ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে বলল, 'পায়ে দিয়ে দেখো তো জুতোটা তোমারই কিনা।'

অনেক চেষ্টা করল বাওবু কিন্তু জুতোটা কিছুতেই ওর পায়ে লাগল না। জেঠী জুতোটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'না বাছা, এটি আমার মেয়ের সেই হারানো জুতো নয়। অন্য কোথাও খোঁজ করে দেখ।'

জুতোটা নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় হঠাৎ শাজাকে দরজার পাশে দেখতে পেল বুলোতুয়ো। জেঠীকে বলল, 'জুতোটা ওই মেয়েটির নয় তো? একবার পরিয়ে দেখুন না?'

জেঠী বিরক্ত হয়ে বলল, 'এমন লাল জুতো ও কোনদিনই পায়ে দেয় নি।'

শাজা ফিসফিস করে বলল, 'দিয়েছি, জেঠী। তার একপাটি কাল হারিয়ে গেছে।'

জেঠী চটে গিয়ে বলল, 'মিথ্যে কথা। তাহলে তার আর এক পাটি কোথায় গেল?'

শাজা বললে, 'এনে দেখাচ্ছি।'

বলেই শাজা ছুটে গেল সেই সাদা ওক গাছের নিচে। সুরঙ্গের ভেতর থেকে এক পাটি লাল জুতো বের করে আবার ফিরে এল ঘরে। দুটো জুতোই পায়ে দিয়ে দেখা গেল একেবারে ঠিকমত এঁটে গেছে ওর পায়ে।

দেখে রাগে হিংসায় যেন ফেটে পড়ল জেঠী। বুলোতুয়ো বুঝতে পারল, শাজাকে আর একদিনের জন্যও এখানে রেখে যাওয়া উচিত হবে না। তাই শাজাকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ফিরে গেল সে। ক'দিন বাদে মহা ধুমধামের ভেতর বিয়ে হয়ে গেল ওদের। বছর ঘুরতেই সুন্দর ফুট-

ফুটে একটি ছেলে হল শাজার। স্বামী আর ছেলে নিয়ে মহাসুখে বাস করতে লাগল শাজা।

এমনি করেই দিন যায়, বছর যায়, একদিন বাওবুকে নিয়ে জেঠী শাজার বাড়ি বেড়াতে এল। এসে হেসে বলল, 'তোর বর কইরে শাজা?'

শাজা ওদের যত্ন করে বসতে দিয়ে বলল, 'ও শিকার করতে গেছে। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে।'

জেঠী বলল, 'জামাই যখন ফিরে আসে তখন কি করে ওর সেবা-যত্ন করিস?'

শাজার কেমন সন্দেহ হয়। তাই যা মনে আসে বানিয়ে বলে দেয়। শুনে একবার নিজের মেয়ের দিকে আড়চোখে ফিরে তাকায় জেঠী। তারপর শাজার দিকে ফিরে বলে, 'চল না শাজা, আমরা বাইরে থেকে কিছু ছত্রাক নিয়ে আসি। রাত্রে তা দিয়ে জামাইকে তরকারি বানিয়ে দেব।'

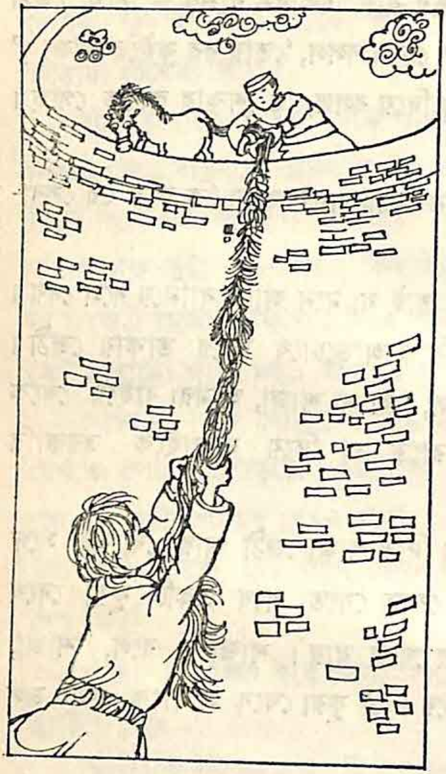
ছেলেকে দোলনায় শুইয়ে দিয়ে শাজা জেঠী আর বোনের সঙ্গে বেরিয়ে যায় ছত্রাক আনতে। যেতে যেতে পথে একটি কুয়া দেখে জেঠীর মাথায় এক বদ মতলব খেলে যায়। শাজাকে বলে, 'শাজা, আমার বড় জল তেষ্টা পেয়েছে রে। ঐ কুয়া থেকে আমাকে একটু জল তুলে দিবি?'

শাজা কুয়ার কাছে গিয়ে জল তোলার জন্য একটু ঝুঁকতেই জেঠী পেছন থেকে এক আচমকা ধাক্কায় ওকে কুয়ার ভেতর ফেলে দিল। তারপর নিজের মেয়েকে নিয়ে ফিরে এল শাজার বাড়িতে।

সন্ধ্যার মুখে বুলোতুয়োর ফেরার সময় হলে জেঠী বাওবুকে বলল শাজার মত পোশাক পরে ছেলে কোলে করে দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়াতে। তারপর শাজা যেভাবে বুলোতুয়োকে আদর যত্ন করে বলেছে, সেই ভাবে আদর যত্ন করতে।

একটু বাদেই বুলোতুয়ো ঘোড়ার পিঠে বাড়ি ফিরে এলে বাওবু তাই করল। বুলোতুয়ো অবাক হয়ে ভাবল, 'শাজার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এমন ভয়ঙ্করভাবে আমাকে আদর আপ্যায়ন করছে কেন ও?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা দুই পা তুলে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠে বলল, 'প্রভু, ও শাজা নয়, বাওবু। শাজাকে তার জেঠী কুয়ার ভেতর ফেলে দিয়েছে। এক্ষুনি চলুন তাকে গিয়ে উদ্ধার করি আমরা।'



ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তীর-বেগে কুয়ার দিকে ছুটে চলল বুলোতুয়ো। কুয়ার কাছে এসে ঘোড়াটা মাটিতে শুয়ে তিনবার গড়িয়ে গেল। দেখতে দেখতে ঘোড়ার লেজটা পনের হাত লম্বা হয়ে গেল।

বুলোতুয়ো সেই লম্বা লেজটা কুয়ার ভেতর নামিয়ে দিল। তখনও কুয়ার ভেতর হাত পা ছুঁড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছিল শাজা। ঘোড়ার লেজটা পেয়ে সেটা নিজের কোমরের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল সে। বুলোতুয়ো সেই লেজ ধরে শাজাকে টেনে তুলল ওপরে।

দূর থেকে এসব কাণ্ড দেখে ভয়ে কাঁপতে শুরু করল জেঠী। বাওবুকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল বুলোতুয়োর হাত থেকে বাঁচার জন্য।

বাইরে তখন ঘন অন্ধকার। মা আর মেয়ে প্রাণের ভয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। ছুটতে-ছুটতে একটা বনের কাছে আসতেই বন থেকে বেরিয়ে এল দু'টো ক্ষুধার্ত নেকড়ে। জেঠী আর বাওবুকে সামনে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। তারপর আশ মিটিয়ে খেয়ে ফেলল হিংসুটে মা আর মেয়েকে।

# মোরগ কেন পোকা খায়

অনেক অনেক কাল আগে মোরগের মাথায় ড্রাগনের মতই শিঙ ছিল। শিঙের গর্বে বুক ফুলিয়ে চারদিকে গট্‌মট্ করে ঘুরে বেড়াত সে। দেখে মনে হত যেন এক বীর যোদ্ধা ঘুরে বেড়াচ্ছে।



একদিন এক ড্রাগন দেখতে এল মোরগটিকে। বিশাল রাজকীয় চেহারার ড্রাগনটি উড়ে এল আকাশ দিয়ে। গায়ের রঙ সবুজ ; কিন্তু গায়ের প্রতিটি আঁশের চারপাশে লালচে আভাস।

অবশ্য যখনকার কথা বলছি তখন ড্রাগনের মাথায় শিঙ ছিল না। মোরগের কাছে আসার সেটাই আসল কারণ তার।

আকাশ থেকে বিশাল ড্রাগনটি এসে নামল মোরগের সামনে। নাক দিয়ে তখন আগুন বেরুচ্ছে না, কিন্তু গরম একটা হল্‌কা বেরুচ্ছে।

গম্ভীর গলায় মোরগকে জিজ্ঞেস করল ড্রাগন, 'মাননীয় মোরগ মহাশয়, কেমন আছেন ? ভাল না মন্দ ?'

মোরগও গম্ভীর স্বরে বলল, 'ভালই আছি, মাননীয় ড্রাগন মশাই।' বলে নিজের মনেই আবার মাটি ঠুকরে খাবার খুঁজতে শুরু করল। একটু থেমে বলল, 'আপনার শরীর ভাল তো ? দিন কেমন কাটছে ?'

ড্রাগন বলল, 'বেশ ভাল।'

মোরগ বলল, 'শুনে খুশি হলাম।'

এরপর আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। ড্রাগন মনে-মনে ভাবছিল, যে কারণে আসা সেটা কিভাবে গুছিয়ে বলা যায় মোরগকে! আর মোরগ ভাবছিল, ড্রাগন হঠাৎ আমার সঙ্গে এমন অমায়িক ব্যবহার করছে কেন? ওর আসল উদ্দেশ্যটা কি?

শেষ পর্যন্ত ড্রাগন এক সময় বলল, 'মোরগভাই, আমার অনেক-দিনের ইচ্ছে একবার স্বর্গরাজ্যে গিয়ে দেবতাদের প্রণাম করে আসি।'

মোরগ বলল, 'এ তো খুব শুভ ইচ্ছে। যান না, ঘুরে আসুন।'

ড্রাগন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কিন্তু কি করে যাব? আমার তো শিঙ নেই।'

মোরগ মনে-মনে সতর্ক হয়ে ড্রাগনের দিকে ফিরে তাকাল। বলল, 'তাতে আপনার যাওয়া আটকাচ্ছে কিসে?'

ড্রাগন হতাশ সুরে বলল, 'শিঙ ছাড়া স্বর্গরাজ্যে গেলে ওখানে সবাই আমাকে ঠাট্টা করবে। আমাকে দেখে হাসাহাসি করবে।'

মোরগ সহানুভূতির সুরে বলল, 'সত্যিই সে খুব দুঃখের কথা হবে!'

ড্রাগন আমতা আমতা করে, আড়চোখে মোরগের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে এই সমস্যা থেকে একমাত্র আপনিই উদ্ধার করতে পারেন, মোরগ মশাই।'

মোরগ বলল, 'কি ভাবে?'

ড্রাগন বলল, 'আপনার ঐ সুন্দর শিঙ দুটো কয়েকদিনের জন্য আমাকে ধার দিয়ে।'

শুনে একটু গম্ভীর হল মোরগ। বলল, 'শিঙ দুটো যে আবার আমি ফিরে পাব তার নিশ্চয়তা কি?'

ড্রাগন বলল, 'আপনার এমন সন্দেহ হতে পারে সে কথা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। পাতালের পোকা তো আপনার খুবই পরিচিত। বন্ধুই বলা যেতে পারে। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন সে আমার পক্ষেই বলবে। আমার হয়ে সেই আপনাকে কথা দেবে যে, আপনার সুন্দর শিঙ দুটো আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

মোরগ ও ড্রাগন দু'জনেই মাটিতে টোকা দিল। মাটির তল থেকে বেরিয়ে এল পোকা। সব কথা শুনে সে মোরগকে বলল, 'ড্রাগন মশাই খুবই সৎ আর বিশ্বাসী। আমি কথা দিচ্ছি, মোরগভাই, উনি কাজ শেষ হলেই তোমার শিঙ তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।'

শুনে নিশ্চিন্ত হল মোরগ। ভাবল, আমার শিঙ মাথায় গুঁজে ড্রাগন স্বর্গরাজ্যে যাবে এ তো আমারই গৌরব। ও ফিরে এলে ওর কাছ থেকে জানা যাবে স্বর্গরাজ্যটা কেমন। তারপর আমিও তো এক-দিন স্বর্গ-ভ্রমণে যেতে পারি!

মোরগ তাই খুশি মনেই নিজের মাথার সুন্দর শিঙ খুলে দিল ড্রাগনকে। ড্রাগন সেই শিঙ মাথায় গুঁজে এক লাফে আকাশে উঠে গেল। শূন্যে ছড়িয়ে দিল ডানা দুটো। নাক দিয়ে বেরিয়ে এল আগুনের হল্‌কা। তারপর উড়ে মিলিয়ে গেল মেঘের আড়ালে।

দিন যায়, মাস যায়, কিন্তু ড্রাগনের আর দেখা নেই। একদিন সকালে সূর্য ওঠার আগে মোরগ একটা উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলল, 'ড্রাগন, আমার শিঙ ফিরিয়ে দিয়ে যাও।...আমার শিঙ ফিরিয়ে দিয়ে যাও, ড্রাগন।'

কিন্তু কোথায় ড্রাগন? মোরগ ভয় পেয়ে মাটিতে টোকা দিয়ে পোকাকে ডাকল। পোকা এসে সব শুনে বলল, 'ভয় পেও না। ড্রাগন ঠিকই তোমার শিঙ ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। আজ না হয় কাল দেবে।'

আবার দিন যায়, মাস যায়, কিন্তু ড্রাগনের দেখা নেই। ততদিনে বুঝতে পেরে গেছে মোরগ, ড্রাগন আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। তখন ওর সব রাগ গিয়ে পড়ল পোকার ওপর। পোকার কথাতেই ও শিঙ দিয়েছে, নাহলে কিছুতেই ড্রাগনকে শিঙ ধার দিত না সে।

আবার মাটিতে টোকা দিয়ে পোকাকে ডাকল মোরগ। সে বাইরে আসতেই খেয়ে ফেলল তাকে। তারপর নিজের ছেলেমেয়েদের আদেশ দিল, তারা যেন এখন থেকে মাটির নিচের যে কোন পোকা দেখলেই খেয়ে ফেলে।'

সেদিন থেকেই মোরগের মাথায় শিঙ নেই; আর পোকাদের জীবনে শান্তি নেই।

## আজব ঝরনা

নির্জন এক পাহাড়ের ধারে বাস করত এক বুড়ো আর বুড়ী। কোন ছেলেমেয়ে ছিল না তাদের। সংসারে লোক বলতে ঐ দু'জনই। রোজ সকালে উঠে বুড়ো বনে যেত কাঠ কুড়োতে। আর বুড়ী ঘরে বসে তাঁত বুনত। এমনি করেই দিন কাটছিল ওদের।

একদিন বুড়ো কাঠ কুড়োতে কুড়োতে বনের ভেতর অনেক দূরে চলে গেল। তার খেয়ালই ছিল না কত দূরে চলে এসেছে। হঠাৎ এক সময় চারদিকে তাকিয়ে মনে হল, সব কিছুই যেন নতুন। আগে কোন দিন দেখেনি। অথচ চিরদিন এই বনেই তো কাঠ কুড়িয়েছে সে!

এবার একটু ভয় পেল বুড়ো। পথ ভুলে এ কোথায় এলাম? যদি আর পথ খুঁজে না পাই? বাড়ি ফিরব কি করে?

যে-পথে এসেছিল আবার সেই পথেই ফিরতে শুরু করল বুড়ো। কিছুটা এগিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল সুন্দর একটা ঝরনা। কাঁচের মত টলটল করছে জল। অনেক পথ হেঁটে খুব পিপাসা পেয়েছিল বুড়োর। পায়ে পায়ে তাই ঝরনার দিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে ঝরনার জলে হাত রাখল। কী ঠাণ্ডা জল!

বয়স হয়েছে, তার ওপর অনেক পথ হেঁটে ক্লান্ত, তাই ঝরনায় নামতে সাহস পেল না বুড়ো। ঝরনার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতের কোষ ভরে আশ মিটিয়ে জল খেল। শরীরটা এবার বেশ ঝরঝরে মনে হল।

কিন্তু উঠতে গিয়ে ঝরনার জলে নিজের মুখের ছায়া দেখে চমকে উঠল। আরে, এ কার মুখের ছবি? বাড়িতে পুরোন আয়নাটায় রোজই নিজের মুখ দেখে, কিন্তু এতো সে-মুখ নয়! মুখটা অবশ্য তারই, কিন্তু এত কচি হয়ে গেল কি করে মুখটা? এ যেন কোন তরতাজা জোয়ান ছেলের মুখ!

আলতো ভাবে মাথায় একবার হাত বোলাল। আশ্চর্য, টাকটা গেল কোথায়? মাথা ভর্তি চুল! গালে হাত বুলিয়ে দেখে মুখের কোঁচকানো চামড়াগুলোও উধাও! এবার নিজের হাত পাগুলোর দিকে তাকাল। অবাক হয়ে দেখল, বুড়ো ঘোড়ার মত জিরজিরে হাড়গুলো সব কোথায় মিলিয়ে গেছে। আঁটসাঁট মাংসে ভরে গিয়েছে শরীর। শরীরেও যেন আগের বল ফিরে পেয়েছে।

এবার বুঝতে পারে বুড়ো, আসলে এই ঝরনাটাই এক আজব ঝরনা। এর জল খেলে সবার বয়স কমে যায়। বুড়োরা হয় যুবক, আর বুড়ীরা যুবতী। না জেনে সেই আজব ঝরনার জল খেয়ে ফেলেছে সে।

যৌবন ফিরে পেয়ে আনন্দে হাত-তালি দিয়ে নেচে উঠল বুড়ো। খুশিতে চীৎকার করে উঠল। তারপর টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটল বাড়ির দিকে।

বুড়ী তখন ঘরে বসে তাঁত বুনছিল। বুড়ো ছুটতে ছুটতে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। হঠাৎ একটা অপরিচিত লোককে এ-ভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠল বুড়ী।

বুড়ো ধমক দিল বুড়ীকে, 'অমন চেঁচাচ্ছ কেন? আমি কি পর-পুরুষ? চিনতে পারছ না আমাকে?'

কে কার কথা শোনে? বুড়ী আরো জোরে চেঁচাতে লাগল।

বুড়ো পড়ল মহা ফ্যাসাদে। কিছুতেই বোঝাতে পারে না বুড়ীকে যে, সে ওরই বর। কিন্তু বুড়ীরই বা দোষ কী? বুড়ো বর বনে গেল, ফিরে এল যুবক হয়ে—একথা কি বিশ্বাস করা সোজা?

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে কথাটা বুড়ীকে বিশ্বাস করাতে পারল বুড়ো। সেই আজব ঝরনার কথা বলল, যার জল খেলে মানুষের বয়স কমে যায়।

তবু যেন বিশ্বাস হয় না বুড়ীর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে বুড়োকে।

বুড়ো একটু হেসে বলে, 'চল না বৌ, তোমাকেও আজব ঝরনার জল খাইয়ে আনি ?'

বুড়ী বলল, 'যেতে তো হবেই। তুমি এখন যুবক হয়েছো, এ-বুড়ী বউ কি আর পছন্দ হবে তোমার ? কিন্তু বাড়ি খালি রেখে দুজনেই যাই কি করে ? বরং এক কাজ কর, ঝরনাটা কোথায় বলে দাও, আমি নিজেই গিয়ে জল খেয়ে আসি।'

বুড়ো বুড়ীকে পথঘাট সব বুঝিয়ে দিল। বুড়ী রওনা হল যুবতী হবার জন্য।

অনেক পথ হেঁটে, গভীর বন পেরিয়ে, বুড়ী শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল সেই আজব ঝরনা। খুশিতে দৌড়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল ঝরনার পাশে। তারপর চোঁ-চোঁ করে জল খেতে শুরু করল। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। মাঝে মাঝে শুধু মুখ তোলে নিঃশ্বাস নেবার জন্য। আবার শুরু করে জল খেতে।

এদিকে বুড়ো বাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে তো করছেই। কিন্তু বুড়ীর পাত্তা নেই। একটু শব্দ হলেই চোখ তুলে তাকায় বুড়ো। ভাবে, এই বুঝি তার বুড়ী বউ লাল টুকটুকে এক বালিকা বধূ হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কোথায় কে ? দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। কিন্তু বুড়ীর দেখা নেই।

এবার ভয় হল বুড়োর, পথে কোন বিপদে পড়ল না তো বুড়ী ? পথ ভুলে আবার বনের ভেতরই ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো ? শেষ পর্যন্ত ঘরের দরজা বন্ধ করে বুড়ো বেরিয়ে পড়ল বুড়ীর খোঁজে।

কিন্তু ঝরনার কাছে এসে বুড়ীকে দেখতে পেল না বুড়ো। আশে-পাশে চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজল। চীৎকার করে ডাকল, 'বউ ?... কোথায় গেলে বউ ?...বউ সাড়া দাও।'

তবু কোন সাড়া নেই। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে বাড়ি ফেরার জন্য পা বাড়াতেই হঠাৎ চমকে উঠল পেছনে একটি বাচ্চা শিশুর কান্না শুনে। ঝরনার পাশে লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে আসছিল কান্নাটা।

বুড়ো দৌড়ে গেল সেদিকে। গিয়ে দেখল, বুড়ীর জামাকাপড় পড়ে আছে মাটিতে। আর তার ভেতর শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে কাঁদছে একটি বাচ্চা মেয়ে। বয়স আর কত হবে? মাস ছয়েক? বুড়ো ঝুঁকে পড়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল, হ্যাঁ, সন্দেহ নেই এ তারই বউ।



আসল ব্যাপারটা এবার বুঝতে পারে বুড়ো। লোভে পড়ে বুড়ী অনেক বেশী জল খেয়ে ফেলেছিল। এত জল খেয়েছিল যে, বুড়ী থেকে যুবতী, যুবতী থেকে বালিকা হবার পরও বয়স ওর ক্রমেই কমছিল। কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত ছয় মাসে এসে দাঁড়িয়েছিল। আরো জল খেলে শেষ পর্যন্ত কি হত কে জানে!

হাজার হলেও নিজের বউ, ফেলতে তো পারে না। তাই চোখের জল মুছে সাবধানে বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল বুড়ো। তারপর মনের দুঃখে নিজের মনেই বিড়বিড় করতে করতে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

# বিড়াল আঁকা ছেলেটি

অনেক দিন আগে জাপানের ছোট্ট একটি গ্রামে বাস করত এক চাষী আর চাষী-বৌ। দু'জনেই ছিল খুব ভাল মানুষ। কিন্তু ভীষণ গরিব ছিল তারা। ওদের ছেলেমেয়ে ছিল অনেকগুলো। তাদের ভাল করে খাওয়াতে পর্যন্ত পারত না তারা।

খেতে না পেলেও ছেলেমেয়েরা বাবা মায়ের দুঃখ বুঝত। হাতে-হাতে তাই অনেক কাজ করে দিত মা বাবার। বড় ছেলেটি চোদ্দ বছর বয়সেই বেশ তাগড়াই হয়ে উঠেছিল। বাবাকে চাষ-আবাদের কাজে অনেক সাহায্য করত সে। মেয়েরা তো প্রায় হাঁটতে শেখার পর থেকেই মাকে হাতে-হাতে সংসারের অনেক কাজ করে দিত।

কিন্তু সমস্যা ছিল ছোট ছেলেটি। জন্ম থেকেই সে ছিল ভীষণ রোগা। কোন ভারী কাজ করতে গেলেই হাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু দুর্বল হলে কি হবে, ছেলেটি ছিল খুবই বুদ্ধিমান।

চাষী আর চাষী-বৌ তাই আলোচনা করে ঠিক করল, ওকে দিয়ে চাষ-বাসের কাজ হবে না। ওর বরং পুরোহিত হওয়াই ভালো। তাতে কোন রকম পরিশ্রম নেই।

তাই একদিন ছেলেটিকে নিয়ে গ্রামের মন্দিরে গেল চাষী আর চাষী-বৌ। বৃদ্ধ পুরোহিতকে প্রণাম করে বলল, 'প্রভু, আমাদের এই ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান। খুব পরিষ্কার মাথা। ওকে আপনি আপনার সাহায্যের জন্য যদি রাখেন তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত হই। পুরোহিত হতে হলে যা যা জানা প্রয়োজন, আপনিই তা ওকে শিখিয়ে নেবেন। আমরা বড় গরিব, আমাদের এই উপকারটুকু করুন, প্রভু।'

শুনে বৃদ্ধ পুরোহিতের মায়া হল। ছেলেটিকে দেখে ভালও লাগল। তাই ওকে কাছে ডেকে বেশ কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করলেন। ছেলেটি এত

সুন্দর আর ঠিক ঠিক উত্তর দিল যে, তার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেলেন পুরোহিত। ছেলেটিকে নিজের সহকারী হিসেবে মন্দিরেই রেখে দিলেন।

অল্প কিছুদিনের ভেতরই অনেক কিছু শিখে ফেলল ছেলেটি। পুরোহিতের কথার খুব বাধ্যও ছিল সে। কিন্তু ছেলেটির একটি মাত্র দোষ ছিল। একবার মাথায় ছবি আঁকার ঝোঁক চাপলে আর কোন কিছুই মনে থাকত না ওর। আর আঁকত শুধু বিড়ালের ছবি। ছবি আঁকার নেশা চাপলে ছবি আঁকার জায়গা অজায়গারও খেয়াল থাকত না।

ছবি আঁকার অত কাগজ কোথায় পাবে? তাই মন্দিরের মেঝে, দেওয়াল, পর্দা,এমনকি মন্ত্রের বইয়ের ভেতরও সে বিড়ালের ছবি আঁকত। বৃদ্ধ পুরোহিত অনেক দিন ওকে নিষেধ করেছিলেন এ সব জায়গায় ছবি আঁকতে! কিন্তু ও কিছুতেই ছবি না-এঁকে থাকতে পারত না। ছবি আঁকার ঝোঁক এলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারত না। আসলে ওর ভেতরে ছিল এক জাত-শিল্পীর প্রতিভা।

পুরোহিত বুঝলেন, ছেলেটি ভাল পুরোহিত কোন দিনই হতে পারবে না। ওর মনের ঝোঁক অন্য দিকে। তাই একদিন তাকে ডেকে বললেন, 'দেখ বাছা, তুমি বরং এ-মন্দির থেকে চলে যাও। তোমাকে দিয়ে পুরোহিতের কাজ কোনদিনই হবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে তুমি হয়তো একদিন নামকরা শিল্পী হতে পারবে।'

ছেলেটি নিজেও এ কথা জানত। তাই মন্দির ছেড়ে যেতে কোন আপত্তি করল না।

ছেলেটি পুরোহিতকে প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় পুরোহিত বললেন, 'তোমাকে একটা শেষ উপদেশ দিই, বাছা। জীবনে কখনও রাতে কোন বড় জায়গায় একা থাকবে না। ছোট আশ্রয় খুঁজে নেবে। বুঝলে তো?'

ছেলেটি অনেক ভেবেও এই উপদেশের মানে ঠিক বুঝল না। লজ্জায় পুরোহিতকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারল না। জামা-কাপড়-গুলো গুছিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে খুব দুঃখ হল ছেলেটির। চিন্তাও হল। কি করবে এখন, কোথায় যাবে, কিছুই ভেবে পেল না। বাড়ি ফিরে গেলে বাবা যখন শুনবেন, পুরোহিতের কথা শোনেনি বলে তিনি ওকে মন্দির থেকে বের করে দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই খুব চটে যাবেন। মেরে হাড় ভেঙে দেবেন ওর।

তাই বাড়িতে আর ফিরবে না ঠিক করল। কিন্তু যাবে কোথায়? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল, পাশের গ্রামে বিরাট একটা মন্দির আছে বলে শুনেছে। সেখানে গেলে হয়তো পুরোহিতের সহকারী হিসেবে একটা কাজ জুটে যেতে পারে। ওখানে গিয়ে না হয় যেখানে সেখানে আর বিড়াল আঁকবে না।

এ-কথা ভেবে সেই গ্রামের দিকেই রওনা হল ছেলেটি।

কিন্তু জানত না ছেলেটি, অনেক দিন আগেই ভয়ে সেই মন্দির ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সেখানকার পুরোহিত। নতুন কোন পুরোহিতও আর আসত না সেখানে। মন্দিরটা তাই খালি পড়ে আছে। গাঁয়ের লোকজনও আর ভয়ে যায় না সেখানে।

কিসের ভয়? ভয়ঙ্কর একটা ভূতের। সেই ভূতটা নাকি কাউকে আর সেই মন্দিরে থাকতে দেয় না। একাই সেই মন্দিরটা দখল করে বসে আছে। কয়েকজন সাহসী বীর কয়েকবার চেষ্টা করেছিল মন্দিরটায় গিয়ে রাত কাটাতে। কিন্তু তাদের একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে নি। সবাই বলে, ভূতটাই তাদের মেরে ফেলেছে।

ছেলেটি যখন সেই গ্রামে এসে পৌঁছাল, তখন রাত হয়ে গেছে। গাঁয়ের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পথঘাট সব ফাঁকা। চারদিক নিঝুম।

চারদিকে চোখ বুলোতে গিয়ে এবার চোখে পড়ল, গ্রামের শেষে পাহাড়ের মাথায় টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। মনে পড়ল, মন্দিরটা তো পাহাড়ের উপরই ছিল বলে শুনেছে। ঐ আলোটা নিশ্চয়ই সেই মন্দিরের আলো।

কিন্তু জানত না ছেলেটি, গ্রামের সবার ধারণা, সেই ভূতটাই রোজ রাতে মন্দিরে ওভাবে আলো জ্বালিয়ে রাখে। আলো জ্বালিয়ে পথিক-

দের লোভ দেখিয়ে নিয়ে যায় ওখানে। তারপর তাদের মেরে ফেলে রক্ত শুষে খায়।

সরল বিশ্বাসে পাহাড়ে উঠে সেই মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটি। দরজা বন্ধ দেখে দরজার কড়া নাড়ল খট-খট করে। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। আবার কড়া নাড়ল—খট-খট, খট-খট।

তবু সাড়া নেই। ব্যাপার কি? মন্দিরে কেউ নেই নাকি? এবার আস্তে দরজাটা ঠেলল ও। ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। যাক দরজাটা তাহলে খোলাই ছিল! মনে মনে খুব খুশি হল ছেলেটি। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখল, মন্দিরের ভেতরে কেউ নেই। শুধু দেবতার বেদীটার ওপর একটা আলো জ্বলছে। গলা তুলে একবার ডাকল সে, 'কে আছেন? মন্দিরে আছেন কেউ?'

কোন সাড়া নেই। ছেলেটি ভাবল, তাহলে বোধ হয় পুরোহিত মশায় ধারে কাছে কোথাও গিয়েছেন। একটু বাদে ফিরে আসবেন।

মন্দিরের এক কোণে গিয়ে বসল সে। বসে বসে পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল, ভেতরটা ধুলোয় একেবারে ভরে গেছে। বিরাট বিরাট মাকড়সার জাল ঝুলছে দেওয়ালে, ছাদে।

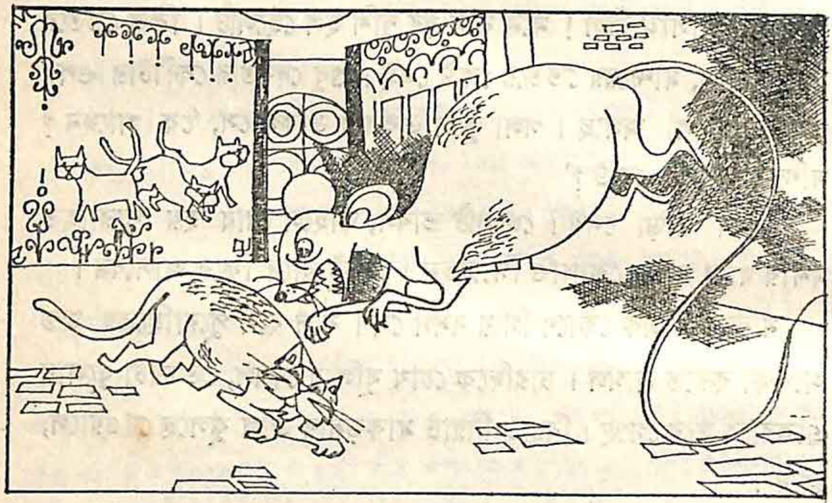
দেখে বেশ খুশি হল ছেলেটি। ভাবল, পুরোহিত নিজে নিশ্চয়ই সময় পান না মন্দিরটা পরিষ্কার করার। ওকে পেলে তাই রেখে দেবেন ওর সহকারী হিসেবে।

আরো খুশি হল মন্দিরের ভেতর বড় বড় কতগুলো সাদা পর্দা দেখে। পুরোহিত মশায় আপত্তি না করলে সুন্দর বিড়ালের ছবি আঁকা যাবে ওর ওপর।

এতটা পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ছেলেটি, কিন্তু ছবি আঁকার কথা মনে পড়তেই উৎসাহে সোজা হয়ে বসল। সঙ্গে এক টুকরো পোড়া কাঠ ছিল ছবি আঁকার জন্য, সেটা দিয়েই পর্দাগুলোয় ছবি আঁকতে বসে গেল।

আঁকতে আঁকতে একসময় ঘুমে ঢলে এল চোখ। পর্দাগুলোর সামনেই শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু হঠাৎই মনে পড়ে গেল বৃদ্ধ পুরোহিত মশায়ের উপদেশটা—রাতে কখনও কোন বড় জায়গায় একা থেক না। ছোট আশ্রয় খুঁজে নিও।

এ কথার অর্থ কি, কে জানে? তবু সাবধানের মার নেই। খুঁজে-পেতে পাশেই একটা ছোট্ট ঘর পেয়ে গেল ছেলেটি। সেই ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে এক কোণে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আর শুতে না শুতেই গভীর ঘুম।



মাঝরাতে পাশের ঘরে বিরাট হট্টগোল আর শব্দ শুনে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ছেলেটির। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি, হুড়োহুড়ি, চেঁচামেচি চলছিল মন্দিরের ভেতর। ভয়ে জিভ শুকিয়ে এল ওর। দরজাটা ফাঁক করে ওঘরে কি হচ্ছে দেখবার সাহস পর্যন্ত পেল না। এককোণে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপতে লাগল।

মন্দিরের আলোটা নিভে গিয়েছিল। ঘন অন্ধকারের ভেতর শব্দটা ক্রমেই বাড়ছিল। চীৎকারে হুঙ্কারে যেন থরথর কাঁপছে মন্দিরটা।

কতক্ষণ এরকম চলল কে জানে, একসময় টের পেল ছেলেটি, আস্তে আস্তে সব শান্ত হয়ে আসছে আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

তবু ভয়ে নড়তে পারে না ছেলেটি। ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, কখন ভোর হবে।

ভোরের আলো ফুটতেই ছেলেটি ছোট ঘরটা থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল। কিন্তু সামনে পা বাড়াতেই চমকে উঠল পায়ের দিকে তাকিয়ে। মন্দিরের ভেতরটা রক্তে থৈ থৈ করছে যেন। আর সেই রক্তের ভেতর মরে পড়ে আছে বিরাট দৈত্যের মত একটা ইঁদুর। দেখেই বুঝল, এটা একটা ইঁদুর ভূত।

কিন্তু মারল কে ভূতটাকে? ঘরে তো কোন মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী দেখা যাচ্ছে না।

চারদিকে চোখ বুলোতে গিয়ে এবার ঘরের সাদা পর্দাগুলোর ওপর দৃষ্টি পড়ে। আর দেখে অবাক হয়, কাল রাতে ও যে বিড়ালগুলো এঁকেছিল তার সব কটার মুখে রক্ত। ঠোঁটে, মোচে তাজা রক্তের দাগ।

এবার বুঝল ছেলেটি, ইঁদুর-ভূতটাকে কারা মেরেছে। কাল ও যে বিড়ালগুলো এঁকেছিল, তারাই।

ইতিমধ্যে গত রাতে মন্দিরে হৈচৈ শুনে কি হয়েছে দেখতে ছুটে এল গ্রামবাসীরা। তারা সব দেখে শুনে আনন্দে জড়িয়ে ধরল ক্ষুদে শিল্পী ছেলেটিকে। বলল, 'তোমার কোন চিন্তা নেই, আজ থেকে তুমি আমাদের গাঁয়েই থাকবে। কোন কাজ করতে হবে না তোমার। তুমি বসে বসে শুধু ছবি আঁকবে। তোমার সব দায়িত্ব আমাদের।'

গাঁয়ের লোকেরা ছেলেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। তারপর একদিন শিল্পী হিসেবে বিরাট নামডাক হল তার। দেশজোড়া খ্যাতি হল।

আর সেই বিড়ালগুলো? গাঁয়ের লোকেরাই গাঁয়ে ঢোকার মুখে খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখল সেই বিড়ালের ছবিগুলো। সবার দেখার জন্য।

## এক সারসের গল্প

বসন্তকাল সবে শুরু হয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় হল প্রচুর তুষারপাত। পথঘাট ডুবে গেল তুষারে। চারদিক অন্ধকার। তারই ভেতর দিয়ে পা টেনে টেনে সাবধানে এগোচ্ছিল একটি ছেলে। বয়েসে তরুণ। হাতে ছিল তার এক সাদা জ্বালানি কাঠ। বৃদ্ধ মা-বাবার জন্য বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল সে কাঠগুলো।

যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল সামনে যেন কিছু নড়ছে। কিন্তু চার-দিকে চোখ বুলিয়ে অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ল না। তবু একবার গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কে ওখানে? ওখানে কি কেউ আছেন?'

কোন সাড়া নেই। আবার সামনে পা বাড়াল ছেলেটি। আবারও শব্দ। মনে হল কোন পাখির ডানার ঝাপটানি। কাঠের বোঝাটা মাটিতে নামিয়ে সামনে এগিয়ে গেল ছেলেটি। গিয়ে দেখল, যা ভেবে-ছিল তাই। তুষারের ভেতর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সুন্দর একটা সারস পাখি। তুষারের মত সাদা ডানার একটিতে একটা তীর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে বিঁধে আছে।

তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে সাবধানে সারসটিকে তুলে নিল ছেলেটি। করুণ চোখে ছেলেটির দিকে তাকাল সারস। সুন্দর ঘাড়টা বেঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে আহত ডানাটা দেখিয়ে দিল।

ছেলেটি একটু হেসে বলল, 'দেখেছি। কোন ভয় নেই, তীরটা বের করে দিচ্ছি আমি। একটুও নড় না।'

সারসটিকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে, খুব সাবধানে, তীরটা ডানা থেকে টেনে বের করে নিল ছেলেটি। তারপর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিল।

আস্তে ডানাটা দু'বার নাড়ল সারসটি। মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে

যেন ধন্যবাদ জানাল ওকে। তারপর ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল।

যতদূর দেখা যায় পাখিটির দিকে তাকিয়ে থাকল ছেলেটি। তারপর কাঠের বোঝাটা তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

রাত্রে খেতে বসে মা বাবাকে সারসের গল্পটা বলল ছেলেটি। তারপর এক দিন ভুলেও গেল সে কথা।

বসন্তকাল শেষ হয়ে এল। চারদিক ভরে গেল রংবেরংয়ের ফুলে। এমন সময় অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে একদিন সেই ছেলেটির বাড়িতে এল। ছেলেটি ও তার বাবা তখন কাজে বেরিয়েছিল। বাড়িতে শুধু বৃদ্ধা মা।

মেয়েটি মাকে বলল, 'আমার মা-বাবা কেউ নেই। অনেক দূরের এক গ্রামে আমার এক কাকা থাকেন বলে শুনেছি। একা তাই রওনা হয়েছি কাকার বাড়ির উদ্দেশ্যে। যদি সেখানে একটু আশ্রয় পাই। আমাকে একটু বলে দেবেন, বনের ভেতর দিয়ে কোন পথে গেলে সেখানে পৌঁছানো যাবে?'

গ্রামের নামটাও মাকে বলল মেয়েটি। মেয়েটিকে দেখে আর ওর কথা শুনে ভারী মায়া হল ছেলেটির মা-র। মেয়েটিকে তাই বললেন, 'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আজকের রাতটা তুমি এখানেই থেকে যাও, বাছা। কাল সকালে না হয় আবার রওনা হবে।'

মেয়েটি আপত্তি জানাল না। সেদিনের মত সেখানেই থেকে গেল ও। হাতে-হাতে মা-র অনেক কাজ করে দিল। ঘরদোর পরিষ্কার করল। নতুন করে ঘর সাজাল। বৃদ্ধা দেখে দারুণ খুশি। মেয়েটি যেন বাড়ির চেহারাই বদলে দিয়েছে!

সন্ধ্যার পর ছেলেটি আর তার বৃদ্ধ বাবাও বাড়ি ফিরে এসে সব দেখেশুনে খুব খুশি হল।

পরদিন সকালে সবাই মেয়েটিকে অনুরোধ জানাল আরো কিছুদিন থেকে যাবার জন্য। মেয়েটি খুশি মনেই রাজী হয়ে গেল। সারাদিন সে নানা কাজে সাহায্য করত মা-কে।

এমনি করেই এক সপ্তাহ কেটে গেল। মেয়েটিকে মা, বাবা আর ছেলেটি এত ভালবেসে ফেলল যে ওকে যেতে দিতে রাজী হল না তারা। এবাড়িতেই থেকে যেতে বলল ওকে।

মা মেয়েটির হাত ধরে বলল, 'বাছা আমাদের কোন মেয়ে নেই। তোমারও মা বাবা নেই। তুমি আমাদের কাছেই থেকে যাও। তোমাকে আমরা নিজেদের মেয়ের মতই আদর যত্নে রাখব।'

ছেলেটিও মেয়েটিকে বলল, 'তোমার কাকাকে তুমি কোনদিন দেখনি। তিনি তোমাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন তাও তুমি জান না। কিন্তু আমার মা বাবা সত্যিই তোমাকে মেয়ের মতই ভালবেসে ফেলেছেন। এ-বাড়িকেই তোমার নিজের বাড়ি ভেবে যদি থেকে যাও আমরা সবাই খুব খুশি হব।'

ছেলেটি মুখ ফুটে বলল না যে, মেয়েটিকে মনে মনে ও ভালবেসে ফেলেছে। আশা করছে, মেয়েটি এখানে থেকে গেলে একদিন ওকে বিয়ে করতে হয়তো আপত্তি করবে না মেয়েটি।

সবার অনুরোধে রাজী হতে হল মেয়েটিকে। নিজেকে এ সংসারের একজন ভেবেই সে থেকে গেল ওদের সঙ্গে।

দিন যায়, মাস যায়। আবার ফিরে এল শীতকাল। আর এল এক বিপদ নিয়ে। অকাল তুষারপাতে নষ্ট হয়ে গেল এ-অঞ্চলের সব ফসল। অভাব নেমে এল গ্রামের প্রতিটি ঘরে।

একদিন মেয়েটি খুব সঙ্কোচের সঙ্গে মা-বাবাকে এসে বলল, 'আপনাদের স্নেহ ভালবাসা, আদর যত্নে অনেকদিন তো কাটালাম এখানে। এবার আমি যাই। আমি গেলে আপনাদের অন্তত একজন খাওয়ার লোক তো কমবে।'

মা বাবা মাথা নেড়ে বললেন,'তা হয় না, বাছা। তুমি আমাদের আপন মেয়ে হলে কি তোমাকে এভাবে যেতে দিতে পারতাম আমরা? তিনজনের চললে আর একজনেরও চলে যাবে।'

ছেলেটিও আপত্তি জানিয়ে বলল, 'তুমি কেন যাবে? আমরা তোমার জন্য যা করেছি, তার চেয়ে তুমি আমাদের জন্য অনেক বেশি

করেছ। তুমি চলে গেলে মা বাবা ভীষণ ভেঙে পড়বেন। তোমার একটু কষ্ট হলেও আমাদের সঙ্গে থেকে যাও।'

মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, 'আমি তোমাদের কথা ভেবেই যেতে চেয়েছিলাম। তোমরা সবাই যখন বলছ, থাকব আমি। সংসারের সব কাজে আগের মতই সাহায্য করব। বরং তার চেয়ে বেশিই কিছু করব।'

মা বললেন, 'তুমি আমাদের অনেক সাহায্য করছ মা, এর বেশি আর কি করবে?'

মেয়েটি বলল, 'আমি রেশমী কাপড়ে খুব সুন্দর নক্সা তুলতে পারি। আমাকে যদি তিন দিন আমার ঘরে একা থাকার অনুমতি দেন, তাহলে বিরাট লম্বা একটা রেশমী কাপড়ে এমন সুন্দর নক্সা তুলে দেব যা আপনারা কোনদিন দেখেন নি। সেটি শহরে গিয়ে বিক্রি করে এলে আকালের দিনক'টা আমাদের ভালভাবেই চলে যাবে।'

শুনে খুশী হয়ে ছেলেটি বলল, 'আমি তাহলে শহর থেকে তোমার জন্য কিছু সিল্কের সুতো কিনে আনি?'

মেয়েটি বললে, 'কোন দরকার নেই। সুতো আর বোনার সরঞ্জাম আমার সঙ্গেই আছে। আমাকে শুধু তিনদিন তিন রাত্তির আমার ঘরে একা থাকতে দিতে হবে।'

ছেলেটি শুনে চিন্তিত হল। বলল, 'তিনদিন ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখলে তুমি খাবে কি করে?'

মেয়েটি বলল, 'রোজ রাতে আমার বন্ধ ঘরের দরজার সামনে কিছু খাবার রেখে দিও। কিন্তু সাবধান, দরজা খুল না কিন্তু। তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি বেরিয়ে এসে খেয়ে যাব।'

ওর কথা সবাই মেনে নিল। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিল মেয়েটি। ছেলেটি রোজ রাতে ওর ঘরের সামনে খাবার রেখে আসত। আবার সকালে গিয়ে খালি পাত্রগুলো নিয়ে আসত।

এমনি ভাবেই তিন দিন কেটে গেল। পরদিন সকালে মেয়েটি ঘরের দরজা খুলে বাইরে এল। ওর হাতে নক্সা তোলা বিরাট এক

রেশমী কাপড়। বৃদ্ধ বৃদ্ধা আর ছেলেটি তো দেখে অবাক। জীবনে এত সুন্দর হাতের কাজ দেখেনি তারা।

সেদিনই বিকেলে শহরে গিয়ে অনেক টাকায় কাপড়টা বিক্রি করে এল ছেলেটি। কিছু টাকা দিয়ে কয়েক দিনের খাবার কিনে আনল। বাকী টাকাগুলো তুলে দিল মা-র হাতে। খুশী হয়ে মা বুকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে।

বেশ সুখেই দিন কাটছিল ওদের। শীতের শেষে আবার শুরু হল তুষারপাত। আকাল দেখা দিল।

মেয়েটি একদিন মা-বাবাকে বলল, 'আবার একটি রেশমী কাপড়ে নক্সা তুলে দিচ্ছি আমি। এবার আরো বেশী টাকায় সেটা বিক্রি করতে পারবে আপনাদের ছেলে। আপনাদের সবার তাতে বেশ কয়েক বছর আর কোন অভাব থাকবে না।'

আগের মতই আবার নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল মেয়েটি। রোজ রাতে ওর দরজার সামনে খাবার রেখে যেত ছেলেটি। সকালে খালি পাত্রগুলো নিয়ে আসত।

কিন্তু মেয়েটিকে মনে-মনে এত ভালবেসে ফেলেছিল ছেলেটি যে, ওকে না-দেখে থাকতে খুব কষ্ট হয়। আরো খারাপ লাগল, ওদের পরিবারের জন্য মেয়েটিকে এত পরিশ্রম করতে দেখে।

তৃতীয় দিন সকালে আর থাকতে না পেরে ছেলেটি ঠিক করল, মেয়েটির ঘরে গিয়ে ওকে ধন্যবাদ জানাবে। আর সেই সঙ্গে জানাবে নিজের ভালবাসার কথা।

মনে-মনে নিজেকে তৈরী করে পেছনের দরজা দিয়ে মেয়েটির ঘরে ঢুকল ছেলেটি। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কাজে বাধা দেবার জন্য আমাকে ক্ষমা ক'র। তোমাকে দুটো কথা বলতে এলাম আমি। প্রথম কথা।—'

কথাটা বলার জন্য চোখ তুলতেই ছেলেটি অবাক হয়ে দেখে, মেয়েটি ঘরে নেই। ওর সামনে এক রাশ রেশমী কাপড় আর সাদা পালকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি সারস পাখি।

ছেলেটি দেখে চমকে উঠল। অস্ফুটে বলল, 'এ কী! কে তুমি? এ কী করে হল?'

সারসটি আস্তে আস্তে ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল। তার পর মেয়েটির মতই মিষ্টি গলায় বললে, 'তুমি যে সারসটিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলে, আমিই সে। মেয়ের রূপ ধরে এসেছিলাম তোমার সেদিনের দয়ার বিনিময়ে তোমাদের কিছু উপকার করতে। সেদিনের ঋণ শোধ করতে। এসে তোমাদের ভালবাসায় জড়িয়ে গেলাম। মনে মনে তাই ঠিক করেছিলাম, তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করব; তোমাকে বিয়ে করে চির-দিন তোমাদের সংসারেই থেকে যাব। কিন্তু তোমার প্রতিশ্রুতি ভেঙে এ-ঘরে প্রবেশ করে সব ব্যর্থ করে দিলে তুমি। এবার আমার বিদায় নেবার পালা।'



ছেলেটি বারে বারে ক্ষমা চাইল সারসের কাছে। কাতর মিনতি জানাল আবার মেয়ের রূপ ধরে ওদের কাছে থেকে যেতে।

সারস করুণ সুরে বলল, 'আর তা হয় না। একবার পাখির রূপ ফিরে পেলে আর মেয়ের দেহে ফিরে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমাদের ভালবাসার কথা কোনদিন ভুলব না আমি। এই নক্সা বোনা রেশমী কাপড়টা থাকল। এটা বিক্রি করে যে টাকা পাবে তাতে আর কোন অভাব থাকবে না তোমাদের। এবার আমাকে বিদায় দাও বন্ধু।'

ছেলেটি আস্তে ঘরের দরজা খুলে দিল। সারসটি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল। করুণ দুটি চোখ তুলে তাকাল ছেলেটির দিকে। চোখ টলমল করছে জলে।

ছেলেটিরও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। আস্তে চোখের জল মুছে সে পাখিটির ডানায় হাত বুলিয়ে দিল। সারস দু'ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল। তারপর মিলিয়ে গেল দূর আকাশে। যত দূর পর্যন্ত দেখা যায় ছেলেটি তাকিয়ে রইল সেদিকে।

তারপর সারসটির একটি সাদা পালক তুলে নিল মাটি থেকে। আজীবন সেই কৃতজ্ঞ সারস আর মেয়েটির স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে নিজের কাছে রাখবে বলে।

## বোকা জেলি মাছের গল্প

এক ছিল সমুদ্র। বিশাল সমুদ্র। সেই সমুদ্রের রাজা ছিলেন বিরাট এক ড্রাগন। রাজা আছেন রানী নেই, এ কেমন রাজ্য ? রাজা তাই ঠিক করলেন বিয়ে করবেন।

বিয়ের কনে ঠিক হল আর এক সমুদ্রের রাজকন্যা।

বিয়ের দিন সে কী ধুমধাম ! সাত সাগরের যত মাছ সবাই এসে জড়ো হল। সঙ্গে আনল মণি মুক্তা হীরে পান্না, সোনা-দানা। কোথায় পেল ? ডুবন্ত সব জাহাজ থেকে। জাহাজ ডুবলে সব সম্পদ যে ওদেরই।

রানী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। গায়ের আঁশ ছিল তার রংবেরঙের। রামধনুকের সাত রং যেন ঝলমল করত তার গায়ে। কিন্তু বিয়ের পর দিন কয়েক যেতেই রানীর হল ভীষণ অসুখ। মাছের রাজ্যে হৈচৈ। সাত সমুদ্রের সেরা সেরা বৈদ্য এল, বৈদ্য গেল—কিন্তু সারাতে পারল না রানীকে। মাছের রাজ্যে শোক নামল, রানী কি তবে বাঁচবেন না ?

শেষ পর্যন্ত রানীই বাতলে দিলেন ওষুধ। চুপি চুপি রাজাকে ডেকে বললেন, 'কি হলে আমি বাঁচতে পারি, জান ?'

রাজা বললেন, 'কি ?'

'জ্যান্ত বানরের যকৃৎ পেলে। এখন মনে পড়ছে, বুড়ি দিদিমা মরার আগে বলে গিয়েছিলেন, যদি কোনদিন এরকম অসুখ হয় তবে জ্যান্ত বানরের যকৃৎ খেলে বেঁচে যাবি।'

রাজার শুনে চক্ষুস্থির। বললেন, 'সে কি ? জ্যান্ত বানরের যকৃৎ ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে রানী ? আমরা থাকি জলের রাজ্যে, ডাঙার জ্যান্ত বানরের নাগাল পাব কি করে ? নাগাল পেলেই বা তার যকৃৎ বের করে আনা কি সহজ কথা ? তুমি বোধহয় ভুল শুনেছ।'

'তুমি আমাকে পাগল বললে ?' রানী ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

—'ওগো, কে কোথায় আছ দেখে যাও গো, কী সুখে আছি! আমি এখানে অসুখে ধুঁকে মারা যাচ্ছি, আর আমার স্বামী সাত সাগরের রাজা হয়েও সামান্য একটা জিনিস এনে আমাকে বাঁচাতে পারছেন না। সামান্য একটা জিনিস চেয়েছি বলে আমাকে পাগল ছাগল কত কি বলে ঠাট্টা করছেন।'

রানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। তা দেখে রাজার চোখে জল এল। রানীর দুঃখে বুক মুষড়ে উঠল। রানীকে বললেন, 'থাম রানী, থাম। দেখি কি করতে পারি।'

রানীকে আদর করে শান্ত করে রাজা বাইরে এলেন। বাইরে এসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন। শেষ পর্যন্ত ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল জেলি মাছের কথা। সব মাছের ভেতর জেলি মাছেরই ছিল সব চেয়ে বড় মাথা। সবার তাই ধারণা ছিল মাছের ভেতর জেলি মাছই সবচেয়ে বুদ্ধিমান। এখন যেমন জেলি মাছের হুল ছাড়া সারা দেহটাই নরম তুলতুলে, তখন কিন্তু তা ছিল না। শরীর ছিল শক্ত সমর্থ। ডানা আর লেজে ছিল প্রচণ্ড শক্তি। রাজা ডেকে পাঠালেন জেলি মাছকে।

একটু বাদেই জেলি মাছ এসে কুর্নিশ করে সামনে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ডেকেছিলেন মহারাজ?'

রাজা বললেন, 'হ্যাঁ, বাছা জেলি, একটা ভীষণ জরুরী কাজের জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। কাজটা যদি করতে পার প্রচুর টাকা পুরস্কার পাবে। খেতাব পাবে। তোমাকে বানিয়ে দেব সমুদ্রের রাজপুত্র।'

জেলি মাছ আবার কুর্নিশ করে বলল, 'হুকুম করুন মহারাজ।'

রাজা বললেন, 'তোমাকে একবার ডাঙার রাজ্যে যেতে হবে। সাঁতার দিতে দিতে সাগর পেরিয়ে গেলে সামনে দেখবে একটা গভীর বন। সেই বন থেকে খুঁজে বের করতে হবে একটা বানর। সেই বানরটাকে জ্যান্ত এখানে এনে হাজির করতে হবে।'

জেলি মাছ ভয়ে ভয়ে বলল, 'কিন্তু কি করে আনব মহারাজ ? জোর করে তো আনা যাবে না।'

রাজা বললেন, 'ভুলিয়ে-টুলিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বানরটাকে লোভ দেখাবে যে, তোমার সঙ্গে এখানে এলে অনেক মজার জিনিস দেখতে পাবে সে। আর ফেরার সময় খুশি মত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে মণি মুক্তা হীরে মানিক। তোমার যা খুশি বানিয়ে বলতে পার, কিন্তু আসল কথা ওকে আনা চাহ-ই চাই। কারণ জ্যান্ত বানরের যকৃৎ না হলে তোমাদের রানীমাকে বাঁচান যাবে না।'

আবার কুর্নিশ করল জেলি মাছ। বলল, 'ভয় নেই হুজুর, আমি যাচ্ছি।'

রওয়ানা হল জেলি মাছ। সঙ্গে নিল বানরটাকে ভোলানর জন্য সাগর তলের মণি মুক্তা হীরে মানিক। তারপর সাঁতরাতে সাঁতরাতে অনেকক্ষণ পরে এসে পৌঁছাল সেই বনের সামনে। চারদিকে একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর আস্তে আস্তে পাড়ে উঠল জেলি মাছ। সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল বনের ভেতর। কিছু দূর এগিয়ে একটা বড় গাছের নিচে বসে হীরে মানিকগুলো নিয়ে খেলতে শুরু করল।

একটু বাদেই ওর মাথার উপরের ছোট্ট ডালটায় এসে বসল একটা বানর। নিচে অত চকচকে মণি মুক্তা দেখে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল ওর। এসব ও জীবনেও দেখে নি।

অবাক হয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল বানর, 'তুমি কে ভাই ?'

'জেলি মাছ।'

'কোত্থেকে এলে ?'

'সাগর তলের দেশ থেকে।'

'এখানে কি করছ ?'

'খেলছি।'

'কি ওগুলো ?'

'মণি মুক্তা, হীরে মানিক, চুনি পান্না।'

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল জেলি মাছ। দু ডানা আর লেজ দিয়ে লোফালুফি করে খেলতে শুরু করল লাল টুকটুক পদ্মরাগ, পান্না, হীরে, মরকত, মণি নিয়ে।

আড়চোখে বানরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যেখান থেকে এসেছি না, সে এক অপূর্ব দেশ। অমন দেশটি দুনিয়ার কোথায়ও খুঁজে পাবে না তুমি। এমন গাছে কোনদিন দোল খেয়েছ যার ডালে ডালে ফলে থাকে পাটল রঙ প্রবাল? গাছের ডাল থেকে নেমে কোনদিন সোনালী রূপালী মাছ ধরেছ? ডুবন্ত জাহাজ থেকে ইচ্ছে মত মণি মুক্তা সোনা দানা নিয়েছ কোনদিন? তাহলে আমাদের দেশে



চল। সেখানে এ সব কিছু পাবে তুমি। যাবে?'

লোভে বানরের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল! বুক নেচে উঠল আনন্দে। টুক করে ডাল থেকে নেমে এল সে। বলল, 'যাব।'

জেলি মাছ ওকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলল। তারপর সমুদ্রের সামনে এসে বলল, 'তুমি তো এমনি যেতে পারবে না, আমার পিঠে আরাম করে চড়ে বস, আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

বানর খুশী হয়ে ওর পিঠে উঠে বসে বলল, 'তা মন্দ কি? চল, তোমাদের দেশটা না হয় দেখেই আসা যাক।'

বানরকে বোকা বানিয়ে মনে মনে আনন্দে নেচে উঠল জেলি মাছ। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সাঁতারে চলল বাড়ির দিকে। কিন্তু অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই মনে মনে ভয় হল বানরের। এভাবে হঠাৎ চলে আসাটা কি ঠিক হল? আর মাছটাই বা চেনা নেই জানা নেই ওর জন্য এত কষ্ট করছে কেন? শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করে বসল বানর, 'আচ্ছা ভাই, তোমার দেশ দেখে আমি ফিরব কি করে? তুমি আবার আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাবে তো?'

জেলি মাছের মাথা বড় হলে কি হবে, আসলে সে ছিল খুবই বোকা। বানরের কথা শুনে একটু হেসে বলল সে, 'সেজন্য এত ভাবছ কেন? তোমার যকৃৎ কেটে বের করে নিলে বোধহয় তোমার আর ফেরার অবস্থা থাকবে না।'

তারপর যেতে যেতে রানীর অসুখের কথা, জ্যান্ত বানরের যকৃৎ খাবার কথা সব খুলে বলল বানরকে। কিছু লুকাল না। অবশ্য মনে-মনে সাহস ছিল ওর, এখন তো আর পালাতে পারবে না বানরটা। সাঁতারই জানে না ও।

কিন্তু বানরটা ছিল জেলি মাছের চেয়ে অনেক বেশি চালাক। ভীষণ ভদ্রভাবে বিনয়ের সঙ্গে বলল ও, 'আহা, আমার কী সৌভাগ্য! রানীর জন্য এমন মহৎ কাজে আমার যকৃৎ লাগবে এতো আনন্দের কথা। ক'জনের ভাগ্যে এমন ঘটে?'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল বানরটা। জেলি মাছ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সে কি ভাই, কাঁদছ কেন?'

চোখের জল মুছতে মুছতে বানর বলল, 'আমাদের কি হবে গো, আমাদের দশা কি হবে? রাজা নিশ্চয়ই রেগে গিয়ে আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলবেন। একেবারে মনে ছিল না আমার, একটুও মনে ছিল না।'

জেলি মাছ ভয়ে থেমে পড়ল। বলল, 'কি মনে ছিল না? কিসের কথা বলছ?'

বানর বলল, 'আমার একেবারে মনে ছিল না। গাছের মাথায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, আসার সময় মনেই ছিল না। তুমি বলা মাত্র মনে পড়ল।'

জেলি মাছ তখন রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছে। বিরক্ত হয়ে বলল, 'আরে বাবা, ব্যাপারটা খুলে বল না। কি ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলে?'

বানর হতাশ হবার ভান করে বলল, 'কি আবার, আমার যকৃৎ! তুমি তো নিশ্চয়ই জান যে, বানরের যকৃৎগুলো যেমন বড় তেমনি ভারী। তাই খেলাধুলা করার সময় আমরা সেগুলো গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখি। রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় আবার গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে যাই।'

শুনে জেলি মাছ ভয় পেয়ে গেল। বলল, 'তাহলে তোমার যকৃৎটা গাছেই রেখে এসেছ?'

বানর বলল, 'হ্যাঁ, তখন একেবারে খেয়াল ছিল না।'

জেলি বলল, তাহলে কি হবে?'

বানর বলল, 'এক কাজ করা যাক। চল বরং ফিরে গিয়ে চট্ করে যকৃৎটা নিয়ে আসা যাক। না হলে রাজা নিশ্চয়ই চটে গিয়ে দুজনকেই মেরে ফেলবেন।'

জেলি মাছও সেই ভয়ই করছিল। বলল, 'সেই ভাল, চল বরং ফিরেই যাওয়া যাক।'

বানরকে পিঠে করে আবার বনের দিকে ফিরে চলল জেলি মাছ। পারে পৌঁছান মাত্র বানরটা এক লাফে ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে গেল জঙ্গলের দিকে। গিয়ে তরতর করে সব চেয়ে বড় গাছটার মাথায় উঠে বসল। তারপর জেলি মাছটাকে ডেকে বলল, 'বুঝলে ভাই, যকৃৎটা তো এখানেও খুঁজে পাচ্ছি না। বোধ হয় কেউ নিয়ে গেছে ওটা। যাকগে, ভেব না তুমি, তোমার জন্য ঠিক ওটা খুঁজে বের করব আমি।'

বলেই খুশীতে কিচির-মিচির করতে করতে এডাল ওডাল লাফিয়ে বেড়াল কবার। ডিগবাজী খেল শূন্যে। লতা ধরে দোল খেয়ে নিল।

তারপর জেলি মাছকে বলল, 'বুঝলে ভাই, সূয্যি মামাতো ডুবল বলে। যকৃৎটা খুঁজে পেতে পেতে হয়তো রাত হয়ে যাবে। চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে যাবে। তোমাদের রাজা মশায় হয়তো ভীষণ চিন্তা করবেন তোমার জন্য। তার চেয়ে তুমি বরং দিন থাকতেই ফিরে যাও। রাজা মশায়কে গিয়ে সব কথা খুলে বলগে। আমি বরং তোমার জন্য কাল সকালে যকৃৎটা নিয়ে এখানেই অপেক্ষা করব।'

বোকা জেলি মাছটা ভাবল, এটা মন্দ প্রস্তাব নয়। বানরের কথা মত বাড়ি ফিরে গেল সে। গিয়ে রাজা মশায়কে আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল।

জেলি মাছের বোকামীর কথা শুনে রাজা ড্রাগন রেগে আগুন। জেলি মাছটা এমন বোকা যে একথাও জানে না, যকৃৎ কোন প্রাণীর দেহের বাইরে থাকে না। দেহ থেকে ইচ্ছে হলেই বের করেও নেওয়া যায় না?

তক্ষুনি রক্ষীদের ডেকে জেলি মাছকে বেদম প্রহার করার হুকুম দিলেন রাজা।

রক্ষী মাছরা রাজার হুকুমে বোকা জেলি মাছটাকে এমন প্রহার দিল যে, ওর শরীরের একটা হাড়ও আর আস্ত থাকল না। আর সেই থেকেই জেলি মাছগুলো এমনি নরম আর এমন খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলে।

আর ড্রাগন রানী যখন জানতে পারলেন যে জ্যান্ত বানরের যকৃৎ আর পাওয়া যাবে না—কোন দিনই নয়—তখন আপনা থেকেই আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠতে লাগলেন।

কি করে?

কে জানে!

অনেক অনেক দিন আগে জাপানে নাকি এক সময় মাকড়সা-ভূত ছিল। দিনের বেলায় তাদের দেখে ভূত বলে চেনাই যেত না। নিরীহ সাধারণ মাকড়সার মতই চারদিকে ঘুরে বেড়াত তারা। কিন্তু যেই না রাত হত, অন্ধকার হয়ে আসত চারদিক, লোকজন ঘুমিয়ে পড়ত, নিঝুম হত চারপাশ—অমনি সেই মাকড়সাগুলো বড় হতে শুরু করত। বড় হতে হতে বিরাট দৈত্যের মত চেহারা হত তাদের। তারপর তারা বেরিয়ে পড়ত মানুষ শিকার করতে।

এই মাকড়সা ভূতগুলো নাকি ইচ্ছে হলেই মানুষের রূপও ধরতে পারত। মানুষের রূপ ধরে পথে কোন মানুষ পেলে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেত নিজেদের গুহায়। তারপর? বুঝতেই পারছ।

এরকম একটা মাকড়সা-ভূতের গল্প আজো জাপানের লোকেদের মুখে-মুখে ফেরে।

বহু দিনের পুরোন ভাঙা একটা পোড়ো মন্দিরে থাকত সেই ভূতটা। মন্দিরটা ছিল গ্রাম থেকে কিছু দূরে একটা বনের ভেতর। দিনের বেলাতেও কেউ সাহস করে যেত না সেই মন্দিরে। কেননা সবাই জানত ঐ মন্দিরে বাস করে এক মাকড়সা-ভূত।

জেনেও কেন সেই ভূতকে মারত না কেউ? ভূত মারা কি এতই সোজা? দেশের বড় বড় ক'জন বীর মাঝে কয়েকবার সে-চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের কেউ আর ফিরে আসেনি। সবাই প্রাণ দিয়েছিল সেই ভূতের হাতে। সেই জন্যই ভয়ে আর কেউ ভুলেও সেই মন্দিরের কাছে যেত না।

এমনি করেই দিন যায়। একদিন সেই গাঁয়েরই এক সাহসী যুবক এগিয়ে এসে বলল, 'এবার আমি যাব। সারা রাত থাকব ওখানে। দেখব, সত্যিই কোন ভূত আছে কিনা। থাকলে তার মোকাবিলা করব আমি।'

গ্রামের লোকেরা তো শুনে অবাক। ছেলেটার মাথা খারাপ হল

নাকি? সবাই ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কারো নিষেধ শুনল না সে।

পরদিন বিকেলে যুবকটি রওনা হল মন্দিরে যাবে বলে। গ্রামের সবাই ওকে মন্দির পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল। সাহসী যুবকটি সবাইকে বলল, 'কাল সকাল পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি তাহলে সকালে উঠেই আমি মন্দিরের ড্রামটা বাজিয়ে দেব। ড্রামের শব্দ না শুনলে বুঝবে আমি মরে গেছি।'

গ্রামের সবাই আবার গ্রামে ফিরে এল। সাহসী যুবকটি ঢুকল সেই ভাঙা পোড়ো মন্দিরটার ভেতর।

ক্রমে সন্ধ্যে হল। অন্ধকার নেমে এল চারদিকে। রাত বাড়ল। কোথাও কোন শব্দ নেই। যেন ভয়ে থমথম করছে চারদিক।

যুবকটি ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বালল। তারপর গুড়িসুড়ি মেরে বসে রইল শূন্য বেদীটার পাশে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু কোথাও কিছু চোখে পড়ছে না। কোন শব্দও কানে আসছে না।

তাহলে কি সবই গুজব? লোকের মনের ভুল?

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে যুবকটি পেছন ফিরে তাকাল। তাকিয়েই ভয়ে চমকে উঠল। দেখল, নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে একটা অদ্ভুত মাকড়সা। শরীরের পেছনের অংশটা নেই তার। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে যেন।

কয়েক পা এগিয়ে এসে বাতাসে ক'বার গন্ধ শুঁকল মাকড়সাটা। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ!'

দম বন্ধ করে দেওয়ালের সঙ্গে লেগে বসে থাকে যুবকটি। এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মাকড়সাটার দিকে।

মাকড়সাটা দেখতে পেল না ওকে। চারদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে গেল আবার।

দেওয়ালের একটা ফাটলে ঢুকে চোখের আড়ালে চলে গেল।

একটু বাদেই যুবকটি আবার চমকে উঠল একটা বাজনা শুনে। মন্দিরের দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি একটা বাজনা।

যুবকটি বুঝতে পারল না, এত রাতে কে ওখানে বসে বাজাচ্ছে? কার এত সাহস?

হঠাৎ দেখতে পেল, একটা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে ভেতরে এসে ঢুকলেন এক পুরোহিত। এমন মিষ্টি বাজনা জীবনে শোনেনি যুবকটি। শুনতে শুনতে ঘুম এসে গেল ওর।

কিন্তু হঠাৎই মনে পড়ল, মাকড়সা-ভূতগুলো তো মানুষের রূপ ধরতে পারে শুনেছি। পুরোহিতের ছদ্মবেশে এটাও সেরকম কোন ভূত নয় তো?

সঙ্গে সঙ্গে সাহসী যুবকটি কোমর থেকে তরোয়ালটা টেনে নিল। এগিয়ে গেল পুরোহিতের দিকে।

পুরোহিত যুবকটিকে দেখে হো-হো করে হেসে উঠলেন। মাথা দুলিয়ে বললেন, 'বুঝেছি, তুমি আমাকে ভূত ভেবেছ, না? না গো, না, আমি এই মন্দিরের পুরোহিত। সারারাত বাজনা বাজিয়ে ভূত-প্রেতগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয় আমার। বাজনাটা কেমন লাগল? ভাল নয়? বাজাবে? নাও না, বাজাও।'

পুরোহিত হাসতে হাসতে বাদ্যযন্ত্রটা এগিয়ে দিলেন যুবকটির দিকে। ওর বাঁহাতে প্রায় গুঁজে দিলেন বাদ্যযন্ত্রটা।

সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রটা মাকড়সার জাল হয়ে জড়িয়ে গেল যুবকটির বাঁ হাতে। তারপর ওর গোটা দেহটাকে জড়িয়ে ফেলার জন্য জালটা ক্রমেই বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আর চোখের নিমেষে পুরোহিত হয়ে গেল বিরাট একটা মাকড়সা-ভূত!

কিন্তু সাহসী যুবকটি এতে একটুও ভয় পেল না। মনে-মনে লড়াই করার জন্য তৈরী হয়েই এসেছিল সে। আচমকা খোলা তরোয়ালটা নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাকড়সা-ভূতটার ওপর।

মাকড়সা ভূতটা হকচকিয়ে গেল এই আচমকা আক্রমণে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে সেও আক্রমণ করল যুবকটিকে।

শুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। সাহসে, গায়ের জোরে দু'জনেই সমান। কেউ কারো চেয়ে কমতি নয়।



যুদ্ধ করতে করতে দু'জনেই যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন যুবকটি একসময় হঠাৎ তরোয়ালটা পুরো বিঁধিয়ে দিল মাকড়সা-ভূতটার বুকে। বিরাট চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ভূতটা। রক্তে ভেসে গেল চারদিক। তারই ভেতর গোঙাতে গোঙাতে বুকে হামা দিয়ে দেওয়ালের সেই ফাটলটার দিকে এগিয়ে গেল সে। তারপর ঢুকে গেল সেই ফাটলের ভেতর।

সাহসী যুবকটি তখন দেওয়ালে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছিল। মাকড়সার জালটা আরো শক্তভাবে জড়িয়ে যাচ্ছিল ওর গায়ে। জালটা ছাড়ানোর যত চেষ্টা করছিল সে ততই জড়িয়ে যাচ্ছিল জালটা। হাজার হলেও ভূতের জাল তো!

এমনি করেই রাত

ফুরোল। সকাল হল। সূয্যিমামা উঁকি দিল আকাশে।

গ্রামের লোকেরা দলবেঁধে ছুটে এল মন্দিরে। ড্রামের আওয়াজ শোনেনি, তবুও।

এসে দেখে, সাহসী যুবকটি মাকড়সার জালে জড়িয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

সবাই মিলে অনেক কষ্টে যুবকটিকে জাল থেকে বের করে আনল তারা। তারপর ওর কাছ থেকে সব কথা শুনে খুঁজতে শুরু করল মাকড়সা-ভূতটাকে।

রক্তের দাগ ধরে খুঁজতে খুঁজতে একসময় সবাই এসে পৌঁছাল মন্দিরের পাশের জঙ্গলে। দেখল, রক্তের দাগটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা গর্তের মুখে।

সাহসী যুবকটি গর্তের মুখে কান পেতে শুনল, ভেতর থেকে একটা চাপা গোঙানীর শব্দ ভেসে আসছে।

সবাই মিলে তখন গর্ত খুঁড়ে টেনে বের করল মাকড়সা-ভূতটাকে। তারপর মারতে মারতে মেরে ফেলল তাকে।

তারপর বীর যুবকটিকে, বাজনা বাজিয়ে পরম আদরে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

এরপর থেকেই সেই মন্দিরে আর কেউ কোনদিন মাকড়সা-ভূত দেখেনি।

এক ছিল বুড়ো চাষী আর চাষী-বৌ। শহর থেকে অনেক দূরে নিরিবিলি একটা গ্রামে বাস করত তারা। ওরা দু'জন ছাড়া সংসারে আর কোন লোক ছিল না। তবে আদরের একটা কুকুর ছিল। নাম ছিল তার শিরো।

চাষী আর চাষীবৌ-এর কোন ছেলেপুলে ছিল না তাই শিরোকে ওরা নিজেদের সন্তানের মতই ভালবাসত। শিরোও ভীষণ ভালবাসত ওদের। সন্ধ্যার পর চাষী আর চাষী-বৌ ক্ষেত থেকে কাজ সেরে ফিরে এলেই ছুটে যেত ওদের কাছে। গায়ে গা ঘষত। খুশিতে লেজ নাড়ত। চাষী চাষী-বৌ-রাত্রে খেতে বসত শিরোকে পাশে নিয়ে। নিজেদের খাবার থেকে খেতে দিত ওকে।

এমনি করেই আনন্দে দিন কাটছিল ওদের।

একদিন চাষী বুড়ো আর বুড়ী বাড়ি ফিরে দেখে শিরো একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভুক্-ভুক্ করে ডাকছে আর পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। চাষীকে দেখে ছুটে গিয়ে তার পোশাক ধরে টেনে আনল শিরো গাছটার কাছে। আবার শুরু করল মাটি আঁচড়াতে।

চাষী বুঝতে পারে না, শিরো কি বলতে চায়। তবু কোদালটা এনে সেই জায়গাটা খুঁড়তে শুরু করে। খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ একসময় ঠং করে একটা শব্দ হল। কি যেন একটা ঠেকল কোদালের মুখে। বুড়ো ভেবেছিল, বোধহয় পাথর। কিন্তু তুলে দেখে বিরাট একটা ঘড়া। ঘড়াটা টাকায় ভর্তি।

এতে রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল বুড়ো আর বুড়ী। শিরো তখন ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আনন্দে লেজ নাড়ছিল।

কিন্তু ঘটনাটা গোপন থাকল না। বুড়োর পাশের বাড়িতেই থাকত ওদের পড়শী—হাতো। লোকটা ছিল ভীষণ হিংসুটে। শব্দ শুনে দু'বাড়ির মাঝখানে যে বেড়া ছিল তার আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সে। আর নিজের চোখে পুরো ঘটনাটাই দেখতে পেয়েছিল। বুড়োকে এভাবে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতে দেখে ভীষণ হিংসে হল

হাতোর। তাই পরদিন সকালে এসে বুড়োকে বলল, 'পড়শী ভাই, তোমার কুকুরটা দেখতে কী সুন্দর! ওকে একদিনের জন্য ধার দেবে আমাকে? একটু আদর-টাদর করে কাল আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'

বুড়োর খুব ইচ্ছে ছিল না শিরোকে দেবার। কেননা এতদিন হাতো দু'চক্ষে দেখতে পারত না শিরোকে। কিন্তু মুখ ফুটে চেয়েছে, কী আর করে? তাই একদিনের জন্য নিজেদের প্রিয় শিরোকে হাতোর হাতে তুলে দিল।

হাতো কিন্তু পরদিন শিরোকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল না। তার পরদিনও না। বাধ্য হয়ে বুড়ো চাষী তাই হাতোর বাড়ি গেল। গিয়ে বলল, 'শিরোকে ছেড়ে তো আমাদের থাকার অভ্যেস নেই। খুব কষ্ট হচ্ছে আমাদের। ওকে ফেরৎ দাও।'

হাতো বলল, 'ফেরৎ দেব কি করে? ও কি আর বেঁচে আছে? কাল রাতে মরে গেছে তোমাদের শিরো।'

'মরে গেছে!' বুড়ো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে থাকে।

আসলে কিন্তু মরে নি শিরো, হাতোই মেরে ফেলেছিল তাকে।

শিরোকে এনে বাগানের সব গাছের নিচে নিয়ে গিয়ে হাতো বলেছিল, 'খোঁড়, মাটি খোঁড়। আমাকেও টাকার ঘড়া বের করে দে।'

শিরো একেবারেই পছন্দ করত না হাতোকে। তাই লেজ গুটিয়ে চুপচাপ বসেছিল ও। এতে চটে গিয়ে হাতো মারতে শুরু করেছিল শিরোকে।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই যেন শিরো একটা গাছের নিচে গিয়ে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে শুরু করল। তা দেখে হাতোর চোখদুটো লোভে জ্বল-জ্বল করে উঠল। কুকুরটাকে পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সেই জায়গাটা খুঁড়তে শুরু করল সে।

একটু খোঁড়ার পরই কোদালটা গিয়ে লাগল একটা পাত্রের গায়ে। পাত্রটা মাটি থেকে টেনে তুলল হাতো।

কিন্তু পাত্রর মুখটা খুলতেই একরাশ ধোঁয়া বেরিয়ে এল ভেতর

থেকে। আর সেই সঙ্গে বিশ্রী একটা গন্ধ। পাত্রর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেখে, পাত্রটা ফাঁকা।

হাতো এবার চটে গিয়ে পাশ থেকে কোদালটা তুলে নিল। তারপর গায়ের জোরে সেটা বসিয়ে দিল শিরোর মাথায়। বেচারী শিরো চীৎকার করে মরে পড়ে গেল সেখানেই। হাতো টাকার জন্য গাছের নিচে যে গর্তটা খুঁড়েছিল তার ভেতরই কবর দিল শিরোকে।



এসব কথা জানতে পারল না বুড়ো চাষী। চোখ মুছে হাতোকে বলল, 'আয়ু ফুরোলে কাউকে তো ধরে রাখা যায় না, সবই নিয়তির খেলা। কিন্তু শিরো ছিল আমাদের ছেলের মত। তাই যে গাছের নিচে ওকে কবর দিয়েছ সেই গাছের একটা ডাল ভেঙে দেবে, ভাই ? শিরোর স্মৃতি হিসেবে সেটাই আমরা ঘরে রাখব।'

হাতো ছিল নামকরা কৃপণ। একটা গাছের ডাল দিতেও মন সরছিল না ওর। তবু চক্ষু লজ্জায় না করতে পারল না। গাছটার একটা ছোট্ট ডাল ভেঙে বুড়োর হাতে দিল।

বুড়ো ডালটা নিয়ে বাড়ি এল। সব কথা খুলে বলল বুড়ীকে। বুড়ী শুনে হাউ-হাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে বলল, 'ঐ কাঠটা দিয়ে ছোট্ট একটা হাতা বানিয়ে নাও। রোজই

দু'বেলা খাবার সময় হাতাটা দেখলে শিরোর কথা মনে পড়বে আমাদের। ওর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে আমাদের মনে।'

বুড়ো তক্ষুণি গাছের ডালটা দিয়ে একটা ছোট্ট হাতা বানিয়ে নিল। তারপর খেতে বসে হাতাটা দিয়ে খাবার নাড়তে গিয়েই অবাক! যত নাড়ছে, খাবার তত বেড়ে যাচ্ছে! যাদু যেন!

বুঝল ওরা, এ-সবই ওদের আদরের শিরোর কাজ। মারা যাবার পরও ওর আত্মা এ-ভাবেই উপকার করে যাচ্ছে ওর প্রভুদের।

দিন কয়েকের ভেতরই কিন্তু হিংসুটে হাতো জানতে পেরে গেল হাতাটার কথা।

একদিন সকালে এসে তাই বুড়োকে বলল, 'আমাদের পুরোন হাতাটা ভেঙে গেছে, তোমাদের নতুন হাতাটা একবেলার জন্য একটু ধার দেবে খুড়ো!'

বুড়ো বুড়ীর খুব ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু হাতাটা হাতোর গাছের ডাল দিয়ে তৈরী করেছে বলে লজ্জায় না বলতে পারল না।

হাতা নিয়ে হাতো বাড়ি চলে গেল। কিন্তু দুদিন যায়, তিনদিন যায়, হাতোর পাত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত বুড়ো একদিন নিজেই হাতোর বাড়িতে গেল হাতাটা ফেরৎ আনতে।

হাতো বলল, 'ও হাতা নেই। পুড়িয়ে ফেলেছি আমি।'

বুড়ো তো অবাক, 'পুড়িয়ে ফেলেছ ? কেন ?'

হাতো বলল, 'পোড়াব না তো কি করব ? হাতাটা আমাদের সব খাবার নষ্ট করে দিয়েছে। হাতাটা দিয়ে খাবার নাড়তেই সব খাবার কালো হয়ে উঠল। বিশ্রী গন্ধ বেরুতে শুরু করল। বিশ্বাস না হয়, এস, নিজের চোখেই দেখে যাও।'

বুড়ো উনুনের সামনে গিয়ে দেখল, সত্যিই আগুনের ভেতর পুড়ছে হাতাটা। দেখে খুব কষ্ট হল বুড়োর। বলল, 'কি আর করব, সবই ভাগ্য! তবু ঐ পোড়া হাতাটার একটু ছাই আমাকে দেবে, ভাই ; শিরোর স্মৃতি হিসেবে ঘরে রাখব।'

ছোট্ট একটা কাঁচের পাত্রে হাতাটার কিছুটা ছাই নিয়ে বাড়ি

ফিরল বুড়ো। সব কথা শুনে বুড়ীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। দু'জনে আলোচনা করে ঠিক করল, এই ছাইটুকু শিরোর স্মৃতিতে একটা গাছের নিচে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর একটু ফুলের গাছ পুঁতে দেবে। সেই গাছে যখন ফুল ফুটবে তখন ফুল দেখলেই তাদের আদরের শিরোর কথা মনে পড়বে ওদের।

কিন্তু বাগানে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল কিছুটা ছাই।

তখন ছিল শীতের শেষ। গাছে গাছে ফোটা ফুল ঝড়ে গিয়েছিল। মরে গিয়েছিল শুকনো ডালের পাতা। কিন্তু ছাইগুলো উড়ে গিয়ে যে যে গাছের ডালে লাগল, সেই গাছেরই মরা ডালে গজাল কচি পাতা। ফুটল তাজা ফুল।

বুড়ো বুড়ী বুঝল, এ-ও তাদের শিরোরই কাজ।

কিছুদিনের ভেতরই কথাটা মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চাষীর বাগানে অকালে এমন রঙ-বেরঙের ফুল আর কচি পাতার সমারোহ দেখে অবাক হল সবাই। খবর নিয়ে জানতে পারল বুড়োর যাদু-ছাইয়ের কথা।

কথাটা একদিন রাজার কানে গিয়েও পৌঁছাল। বুড়ো চাষীকে খবর পাঠালেন রাজা সেই ছাই নিয়ে একবার রাজপ্রাসাদে হাজির হবার জন্য।

বুড়ো এসে হাতজোড় করে রাজার সামনে দাঁড়াল। নত হয়ে প্রণাম করে সব কথা খুলে বলল রাজাকে। কিছুই লুকোল না।

রাজা খুশি হয়ে বললেন, 'বুঝলে ভাই, আমার শোবার ঘরের জানলার পাশে একটা চেরী ফুলের গাছ আছে। আমার খুব শখের গাছ। কিন্তু কিছুদিন হল কেন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে গাছটা। আমার ভয় হচ্ছে, এই শীতেই গাছটা না মরে যায়। তুমি তোমার যাদু-ছাই দিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখ না, গাছটাকে বাঁচাতে পার কিনা!'

বুড়ো চাষী রাজাকে প্রণাম করে ছাইগুলো নিয়ে সেই গাছটার কাছে গেল। মনে মনে শিরোর উদ্দেশ্যে বলল, 'আমার আদরের শিরো, আমার মুখ রেখ।'

তারপর পাত্রটা থেকে কিছুটা ছাই নিয়ে মাখিয়ে দিল শুকনো চেরী গাছটার ডালগুলোয়। আর, আশ্চর্য! দেখতে দেখতে মরা গাছটা যেন নতুন করে বেঁচে উঠল। শুকনো ডালগুলো ভরে গেল তাজা ফুল আর পাতায়।

রাজা দেখে দারুণ খুশি হলেন। বুড়ো চাষীকে থলি ভর্তি সোনার টাকা উপহার দিলেন।

হিংসুটে হাতো এ-খবর পাওয়া মাত্র হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। হঠাৎ মনে পড়ল, পোড়ানো হাতার কিছুটা ছাই তো এখনও ওদের উনুনের মধ্যে আছে।

সেই ছাই নিয়ে রাজার প্রাসাদে গিয়ে তাঁকে বলল, 'মহারাজ, আমার কাছেও কিছু মন্ত্রপড়া ছাই আছে। আমার পড়শী বুড়োটা সেই ছাই চেয়ে এনেই আপনার চেরী গাছটাকে বাঁচিয়েছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে এই ছাই দিয়ে আপনার বাগানের বাকী শুকনো গাছগুলোয় আমি ফুল-ফল-পাতা গজিয়ে দিতে পারি।'

রাজা বললেন, 'এতে আর আপত্তির কি আছে? চেষ্টা করে দেখ।'

হাতো প্রহরীদের সঙ্গে প্রাসাদের বাগানে গেল। তারপর একটা বড় গাছের উঁচু ডালে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে দিল পাত্রের ছাইগুলো।

আর, আশ্চর্য! যে গাছের ডালে গিয়ে লাগল সেই ছাই, সেই গাছগুলো আরো শুকিয়ে গেল। গাছ থেকে নিচে ভেঙে পড়ল কিছু পোড়া ডালপালা। চারদিকে বিশ্রী একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

আর কিছুটা ছাই উড়ে গিয়ে পড়বি তো পড় একেবারে রাজার চোখে।

রাগে রাজা চীৎকার করে বললেন, 'এই মুহূর্তে বন্দী কর ওকে। বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাও। যত দিন বেঁচে থাকবে লোকটা, কারাগারেই বন্দী থাকবে ও।'

হিংসার উপযুক্ত শাস্তি পেল হাতো। আর সেই চাষী বুড়ো-বুড়ী?

ওদের ক্ষতি করার আর কেউ রইল না বলে সুখে দিন কাটতে লাগলো ওদের। আর ফুলে ফলে ভরা বাগানের ভেতর দিয়ে ওদের মনে চিরদিন বেঁচে রইল আদরের কুকুর শিরোর স্মৃতি!

# যে লোকটি মরতে চায়নি

কোন এক সময়ে জাপানে এক বিরাট ধনী লোক ছিলেন। নাম ছিল তাঁর সেন্তারো। বাড়িতে তাঁর সোনা-দানা হীরে মুক্তোর ছড়াছড়ি। খানা-পিনা আমোদ আহ্লাদে মহানন্দে দিন কাটছিল তাঁর।

কিন্তু দিন তো সবার সমান যায় না, হঠাৎ একদিন সেন্তারো খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দেশের সেরা বৈদ্যকে ডেকে আনা হল। তিনি সব কিছু পরীক্ষা করে বললেন, 'কঠিন রোগ। খুব সাবধানে থাকবেন, না হলে মরেও যেতে পারেন।'

মরে যাব! শুনে ভয়ে শিউরে উঠলেন সেন্তারো। এমন সুন্দর পৃথিবী, এত আনন্দ ছেড়ে চির দিনের জন্য বিদায় নেবার কথা ভাবতেই পারেন না সেন্তারো। ভাবনা চিন্তায় দিনের পর দিন শুকিয়ে যেতে থাকেন তিনি। রোগ বেড়েই চলে।

শেষ পর্যন্ত একদিন মনে মনে ভাবলেন সেন্তারো, না, মরব না। অমর হতে না পারলেও অন্তত দু'তিনশ' বছর বেঁচে থাকতে চাই আমি।

তক্ষুনি নিজের লোকজনদের ডেকে পাঠালেন। আদেশ দিলেন, 'বই আন। এই পৃথিবীতে অনেক অনেক বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন যে সব সাধু সন্তরা, তাঁদের কথা লেখা আছে যেসব বইতে এক্ষুনি তা সংগ্রহ করে আন।'

দেখতে দেখতে ঘরে বইয়ের পাহাড় জমে গেল। বইয়ের ভেতর ডুবে গেলেন সেন্তারো।

পড়তে পড়তে হঠাৎ একটি বইয়ে পেয়ে গেলেন 'জোফুকু ও চিরযৌবন লাভের পবিত্র জলের' একটি প্রাচীন কাহিনী।

সে এক ভারী মজার গল্প। অনেক অনেক দিন আগে নাকি এক রাজা জানতে পেরেছিলেন যে, ফুজি পাহাড়ের মাথায় এমন একদল

সাধু আছেন, যাঁদের মন্ত্রপড়া জল খেলে মানুষ চিরদিন যুবক থাকতে পারে। কোন দিন বৃদ্ধ হয় না।

রাজার মনে মনে ইচ্ছে হল, কাউকে দিয়ে সেই জল আনিয়ে নিজে খাবেন। চিরদিন যুবক থাকবেন। কিন্তু বিশ্বাস করে কাকে পাঠানো যায় সেই জল আনতে ? অনেক ভেবে বিশ্বাসী মন্ত্রী জোফুকুর কথা মনে পড়ল তাঁর। তাঁকেই গোপনে পাঠালেন সেই জল আনতে।

কিন্তু সেই যে গেলেন জোফুকু আর কোনদিনই ফিরে এলেন না তিনি। লোকে বলে, জোফুকু নাকি সত্যিই ফুজি পাহাড়ের মাথায় খুঁজে পেয়েছিলেন সেই সাধুদের। তারপর তাঁদের কাছ থেকে সেই মন্ত্র-পড়া জল খেয়ে চিরযৌবন লাভ করে সেখানেই তিনি থেকে গিয়েছিলেন। কোনদিনই আর দেশে ফেরেন নি।

এই কাহিনী পড়ে মনে মনে ঠিক করলেন সেন্তারো, তিনিও গোপনে ফুজি পাহাড়ে যাবেন। সেই মন্ত্র-পড়া জল খেয়ে আবার চুপিচুপি ফিরে আসবেন দেশে।

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন সেন্তারো। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু ফুজি পাহাড় তো এখানে নয়। হাঁটছেন তো হাঁটছেনই, পাহাড় আর আসে না।

তারপর পুরো ছয়মাস হাঁটার পর একদিন তিনি এসে পৌঁছালেন ফুজি পাহাড়ের নিচে। বিশ্রাম করে আবার অসুস্থ শরীর নিয়েই পাহাড়ে উঠতে শুরু করলেন।

অনেক কষ্টে পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখলেন, কাঠুরিয়া সত্যি কথাই বলেছিল। একজনও সাধু নেই সেখানে। থাকার ভেতর আছে একটি শূন্য মন্দির। অনেক দিনের পুরোন। ভেঙে ভেঙে পড়ছে। দেখেই বোঝা যায় বহু বছরের মধ্যে কোন মানুষজন আসেনি এখানে। কিন্তু মন্দিরটা ভেঙে গেলেও মন্দিরের ভেতর ফুজি দেবতার বেদীটা এখনও ঠিকই আছে।

পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন সেন্তারো। বেদীটার সামনে এসে চোখ বুজে বসে পড়লেন তিনি। মনেমনে ডাকতে শুরু

করলেন দেবতাকে।

সাত দিন সাত রাত কেটে যাবার পর একসময় বেদীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন দেবতা ফুজি। চারদিকে তাঁর আলোর ছটা। অন্ধকারেও জ্বলছেন যেন।

সেন্তারোর সামনে এসে স্নেহের সুরে বললেন তিনি, 'তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি, সেন্তারো। বল, কি চাও?'

সেন্তারো হাতজোড় করে বললেন, 'আমি সেই মন্ত্র-পড়া পবিত্র জল চাই, যা খেলে মানুষ চিরদিন যুবক থাকতে পারে।'

দেবতা বললেন, 'সে জল আমি দিতে পারি না। কিন্তু তার চেয়েও তোমাকে অনেক বেশি দিতে পারি। তোমাকে আমি এমন দেশে পাঠাতে পারি, যেখানে কেউ কোনোদিন মরে না। সেখানে গেলে তুমি চিরজীবন বেঁচে থাকতে পারবে। যাবে সেখানে?'

সেখানে গেলে অমর হওয়া যায়! আনন্দে অধীর হলেন সেন্তারো। বললেন, 'আমাকে সেখানেই পাঠিয়ে দিন, প্রভু।'

দেবতা ওঁর হাতে ছোট্ট একটুকরা ভাঁজ-করা কাগজ দিলেন। বললেন, 'এটাই তোমাকে সেই দেশে নিয়ে যাবে। নাও।'

সেটা দিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন দেবতা।

সেন্তারো তো মহা খুশি। কাগজটা নিয়ে খুলতেই সেটা একটা কাগজের পাখি হয়ে গেল। ডানা নাড়তে শুরু করল।

সেন্তারো লাফিয়ে পাখিটার পিঠে উঠে বসলেন। তারপর উড়ে চললেন পাহাড়-সমুদ্র-মরুভূমি পেরিয়ে।

এইভাবে সাত দিন সাত রাত ওড়ার পর পাখিটি সেন্তারোকে নিয়ে এসে পৌঁছাল এক আশ্চর্য দেশে। সেখানে যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। যেন সবুজ সমুদ্র।

পাখিটা এখানে নেমে ডানা গুটিয়ে নিল। তারপর ছোট হতে হতে আবার সেই আগের মত একটা ভাঁজ-করা কাগজ হয়ে গেল। সেন্তারো কাগজটা জামার পকেটে রেখে দেখতে বেরুলেন সেই নতুন দেশ।

একটু এগিয়ে দেখলেন গাছে গাছে ফলে আছে রঙবেরঙের নাম-না জানা ফুল, ফল। ডালে ডালে নেচে বেড়াচ্ছে চোখ-জুড়োনো পাখি। গাইছে তারা মন ভুলোনো গান।



কিন্তু অবাক হলেন সে দেশের লোকদের দেখে। তাদের কারো মুখে হাসি নেই। সবারই গুমরো মুখ। যেন হাসতে তাদের মানা।

শুধু তাই নয়, কদিন পরেই বুঝতে পারলেন সেন্তারো, রাতদিন তারা মরার চেষ্টা করছে। অজানা ফল খেয়ে দেখছে, ফলটা বিষাক্ত কিনা। উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আত্মহত্যার জন্য। কিন্তু কিছুতেই মরছে না তারা।

একদিন ভয়ে ভয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন সেন্তারো, 'তোমাদের এখানে এত সুখ, এত আনন্দ, তবু তোমরা মরতে চাও কেন? আমাদের পৃথিবীর সব মানুষ তো চায় অমর হয়ে থাকবে!'

লোকটি গম্ভীর মুখে বলল, 'পৃথিবীর মানুষগুলো বোকা তাই অমর হতে চায়। আরো কিছুদিন থাক এখানে তাহলেই বুঝবে, আমরা মরতে চাই কেন?'

লোকটার কথার মানে বুঝলেন না সেন্তারো। তিনি আশ মিটিয়ে এখানকার সুখ ভোগ করতে লাগলেন।

কিন্তু একশ' বছর কাটার পর সেন্তারোর কাছেও ক্রমে সব কিছু কেমন যেন একঘেয়ে, পুরোন মনে হতে লাগল। কোন কিছুর আর

নতুন স্বাদ নেই। নতুন কোন কিছুর আকর্ষণ নেই।

ক্রমে এই একঘেয়ে জীবনে এক সময় হাঁপিয়ে উঠলেন সেন্তারো। মনে হতে লাগল, এবার যদি মরে স্বর্গে যেতে পারতাম, তাহলে আর কিছু চাইতাম না আমি।

নিজেও এবার নানাভাবে মরবার চেষ্টা করতে লাগলেন সেন্তারো। কিন্তু বৃথা। এ যে অমরের দেশ। এখানে এলে কেউ আর মরে না কোনদিন। মরতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত একদিন নিরুপায় হয়ে দেবতা ফুজির কাছে প্রার্থনা জানালেন সেন্তারো, 'প্রভু, আর আমি অমর হতে চাই না। আমাকে তুমি মরার সুযোগ দাও, অথবা উদ্ধার কর এদেশ থেকে।'

প্রার্থনা শেষ হবার আগেই তাঁর জামার পকেটে কী যেন একটা নড়ে উঠল। এতদিন পর হঠাৎ আবার মনে পড়ল ওঁর কাগজের পাখিটার কথা। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করলেন পাখিটাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা আবার বড় হতে শুরু করল।

সেন্তারো এক লাফে উঠে বসলেন পাখিটার পিঠে। পাখিটা ডানা ঝাপটিয়ে উঠে গেল আকাশে। তারপর উড়ে যেতে লাগল দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে। মুক্তির আনন্দে গান গাইতে শুরু করলেন সেন্তারো।

কিন্তু পাখিটা যখন বিশাল একটা সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। পাখিটা ঝড়ের দাপটে টাল সামলাতে পারছিল না। তার উপর বৃষ্টিতে ভিজে ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছিল। নেমে যাচ্ছিল সমুদ্রের দিকে।

ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন সেন্তারো। পাখিটাও ভেঙে পড়ল সমুদ্রের বুকে।

উত্তাল সমুদ্র। পাহাড়ের মত ঢেউগুলো এসে আছড়ে পড়ছে সেন্তারোর উপর। আতঙ্কে চীৎকার করে উঠলেন তিনি, 'বাঁচাও, ঈশ্বর, বাঁচাও।'

চীৎকার করতেই ঘুম ভেঙে গেল সেন্তারোর। দেখলেন, সেই নির্জন

মন্দিরের ভেতর বেদীর সামনে শুয়ে আছেন তিনি। সামনে বসে এক সাধু। বুঝতে পারলেন, এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি।

সাধু ওঁকে চোখ মেলতে দেখে বললেন, 'কে তুমি? ঘুমের ভেতর অমন চীৎকার করে উঠলে কেন?

সেন্তারো নিজের পরিচয় দিলেন। নিজের সবকথা খুলে বললেন সাধুকে। স্বপ্নের কথাটাও বললেন।

সব শুনে সাধু বললেন, 'এই স্বপ্ন থেকেই বুঝতে পারবে, বৎস, যে মরতে কারো ভয় পাওয়া উচিত নয়। চিরদিন বেঁচে থাকাটা খুব সুখের নয়। ভগবান যে ক'দিন আয়ু দিয়েছেন, তাই হাসি মুখে মেনে নেওয়া উচিত সব মানুষের।'

সেন্তারো বললেন, 'আপনি কে প্রভু?'

সাধু বললেন, 'আমি এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছিলাম। এসে তোমাকে দেখলাম। তোমার সব কথা শুনলাম। এই স্বপ্ন থেকে তুমি আরো শিখতে পারলে, সেন্তারো, যে সত্যি যারা মানুষের মত মানুষ তারা বেশি দিন বাঁচতে চায় না, চায় বেশি জ্ঞানী গুণী হয়ে বাঁচতে। সবার উপকার করে যেতে। তাহলেই মরার পরও মানুষ মনে রাখে তাকে। মানুষের মনে সে অমর হয়ে থাকতে পারে।'

সাধুকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন সেন্তারো। আবার নিজের দেশে ফিরে এলেন।

এর পর থেকেই যেন এক নতুন জীবন লাভ করলেন তিনি। শুধু নিজের আমোদ-আহ্লাদ আর সুখের কথা না ভেবে সবার সুখের কথা ভাবতে শুরু করলেন। নিজের সব সম্পদ বিলিয়ে দিলেন দরিদ্রদের ভেতর।

তাই বৃদ্ধ বয়সে যখন মারা গেলেন সেন্তারো, তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে এসে জড়ো হল দেশের সব মানুষ। চোখের জলে বিদায় দিল তারা মানবদরদী সেন্তারোকে।

অমর হতে চেয়েছিলেন সেন্তারো, এভাবেই তিনি সবার মনে চিরদিনের জন্য অমর হয়ে রইলেন। মনোবাসনা পূর্ণ হল তাঁর।